দাম : ষোলো টাকা

ইউনিফর্ম সিভিল কোড কোনোভাবেই মুসলমান বিরোধী নয়। — পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম, কংগ্রেসের দিদি-মোদী সেটিং তত্ত্ব বুমেরাং হয়ে ফিরেছে — পৃঃ ১৭

৭৫ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।। ১৭ জুলাই, ২০২৩।। ৩১ আষাঢ় - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

এক দেশ, এক আইনের জন্যই চাই

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ৩১ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৭ জুলাই - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

রক্ষক যখন ভক্ষক, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু...

□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ইউক্রেনকে হারিয়ে এগিয়ে বাংলা, জয় দিদিরাজের জয়

□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

মহারাষ্ট্রে তিন দল একত্রিত মানেই কোনো মহাজোট নয়

□ আর. জগন্নাথন □ ৮

খালিস্তানি জঙ্গি-কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ ভারতের

□ বিশ্বামিত্র □ ১০

ইউনিয়ন সিভিল কোড কোনোভাবেই মুসলমান বিরোধী নয়

□ সাধন কুমার পাল □ ১১

ভারতে মুসলমানদের আরবীয়করণের প্রক্রিয়া স্বাধীনতার আগে থেকেই চলছে □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৩

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই হবে ইন্ডিয়ান সিভিল কোড

□ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় □ ১৫

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম, কংগ্রেসের দিদি-মোদী সেটিং তত্ত্ব বুমেরাং হয়ে ফিরছে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১৭

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ঐক্যসাধনার ব্রতে দীপ্তিমান

□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৩

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ঠিক কী ধরনের বদল আসতে চলেছে?

□ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ২৬

আত্মঘাতী লেমিং এবং ওরা, আমরা □ নারায়ণ শঙ্কর দাস □ ২৮

রামপ্রসাদের তন্ত্রসাধনা ছিল মাতৃসাধনা □ দীপক খাঁ □ ৩১

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এবং মানবজীবন □ দেবব্রত ঘোষ □ ৩৩

আধুনিক ভারতে জনবিন্যাস পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হলো সাম্প্রদায়িক হিংসার বাড়বাড়ন্ত □ অনির্বাণ দে □ ৩৫

গত দেড়শো বছরে জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়ে এপারে এসে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩০ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৪ জুলাই, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৪ জুলাই, ২০২৩

পঞ্চায়েত প্রহসন

রক্তপাত, খুনোখুনি, অবাধ ছাপ্পা আর ব্যালট লুঠের মধ্যে দিয়ে শেষ হলো পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর্ব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে নির্বাচন পর্বে ৪০ জন মানুষ খুন হলেন তাকে কী করে সুষ্ঠু নির্বাচন বলা চলে। যে নির্বাচন পর্বের শুরু থেকেই রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ, নির্বাচন কমিশন জোট বেঁধে বিরোধী শূন্য করার চেষ্টা করেছে তাকে অবাধ নির্বাচন কীভাবে বলা যায়? সরকারি মদতে এমন নির্লজ্জ তাণ্ডব উদাহরণ হয়ে থাকল সারা দেশে।

পশ্চিমবঙ্গের এই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ থাকবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংখ্যালঘুরা শুধুমাত্র ভোটব্যাংক নহে

চতুর ইংরাজরা ভারতবর্ষে শাসন কায়েম করিয়াছিল বিভেদের বীজ বপন করিয়া। এই দেশে বসবাসরত নানান সম্প্রদায়ের জন্য নানান আইন প্রণয়ন করিয়া এই দেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক একত্বের উপর আঘাত হানিয়াছিল। পরিণামে দেশের বিভাজন ঘটিয়াছে। মাতৃভূমির বিভাজন স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তৎকালীন নেতৃবর্গ ইংরাজ প্রবর্তিত ভেদনীতিকেই বৎসরের পর বৎসর বহাল রাখিয়াছে। ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধানে ধীরে ধীরে এক দেশ এক আইনের কথা বলা হইলেও শাসক কংগ্রেস দল তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। বরং তাহারা ১৯৫৬ সালে হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও হিন্দু কোড বিল প্রবর্তন করিয়া হিন্দু সমাজকেও নূতনভাবে খণ্ড বিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহার পূর্বে তাহারা ৩৭০ ও ৩৫এ লাগু করিয়া জম্মু-কাশ্মীকে অবশিষ্ট ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ রাষ্ট্রবাদী নেতার এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান ও দুই প্রধানের বিরোধিতাকে তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বরাবর তাহারা শ্যামাপ্রসাদকে শত্রু মনে করিয়াছে। কংগ্রেসের দোসর হিসাবে কাজ করিয়াছে কমিউনিস্টরা। অদ্যাবধি তাহারা ভারতকে এক জাতি মনে করে না। স্বাধীনতার পূর্বে তাহাদের দাবি ছিল প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য ভারতকে পৃথকভাবে ভাগ করিতে হইবে। মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবিকে তাহারা সোচ্চার সমর্থন জানাইয়াছে। অদ্যাবধি তাহাদের সেই মানসিকতার পরিবর্তন হয় নাই। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট-সহ আঞ্চলিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া মুসলমানদিগকে ভারতীয় হিসাবে না দেখিয়া ভোটব্যাংক হিসাবে দেখিয়াছে এবং তাহাদের সেইভাবেই ব্যবহার করিয়াছে এবং করিয়া চলিতেছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশের শাসনক্ষমতায় থাকিলেও দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কেনোরূপ চেষ্টা করে নাই। চতুর ইংরাজদিগের ভেদনীতিকে তাহারা শুধু বহালই রাখে নাই, ক্ষমতার লোভে তাহার ব্যবহার পর্যন্ত করিয়াছে। এক দেশ, এক জাতি, এক আইনের কথা যাহারা বলিয়াছেন, তাহাদিগকে কংগ্রেস দেশের শত্রু মনে করিয়াছে। দেশের অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রাণ বলিদান করিতে হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের উত্তরসূরী দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাধীনতার পঁচাত্তর বৎসর পর যখন এক দেশ এক আইন প্রণয়নের পথে অগ্রসর হইতেছেন তখন পুনরায় কংগ্রেস-কমিউনিস্ট প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী ভোটভিখারি দলগুলি তাহার বিরোধিতায় সরব হইয়াছে। তাহারা অপপ্রচার করিয়া দেশের মানুষকে বিশেষত মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় বিন্দুমাত্র আন্তরিক নহে। বিভাজনের রাজনীতি করিয়া ক্ষমতা ভোগ করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। তাহারা যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন,সংবিধানের প্রতি তাহারা বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধ নয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বারবার বলিয়াছে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ভারসাম্য আনিবার জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে— সেই বিষয়ে বরাবর তারা উদাসীন থাকিয়াছে। বিরোধী দলগুলির ভয়, মোদী সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহাদের ভোট রাজনীতির দিন সমাপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে। পরতন্ত্রের পরিবর্তে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে, তাই তাহাদের এত ভয়। তাহাদের বোধগম্য হইতেছে না, দেশের একতা , অখণ্ডতা, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমানতার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করিয়াই উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

ঐক্যং বলং সমাজস্য তদভাবে স দুর্বলঃ।

তস্মাৎ ঐক্যং প্রশংসতি দৃঢং রাষ্ট্রহিতৈষিণঃ।।

সমাজের শক্তি হলো একতা। তার অভাবে সমাজ দুর্বল হয়। এজন্য রাষ্ট্রহিতৈষী ব্যক্তিগণ দৃঢ়ভাবে একতার প্রশংসা করে থাকেন।

রক্ষক যখন ভক্ষক

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু...

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পাঠকরা একটু নজর করলেই বুঝতেন ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে কী হতে চলেছে। ৮ জুলাই ভোটের দিন রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান ছবি ছিল 'রাইফেলধারী পুলিশ'। তখনই বোঝা গিয়েছিল যে ওই দিন বোমা, বন্দুক, পিস্তল আর রাইফেলের উৎসব হবে। মানুষের ভোট নয়। শকুন বা শৃগাল নই বলে পঞ্চায়েত ভোটে মৃতের সংখ্যা গুনছি না। সংবাদপত্র বলে দিয়েছিল ভোটে রক্তস্নান স্বাভাবিক। এ রাজ্যে রক্ষকই ভক্ষক। তবে প্রতিরোধের মুখে শিকারি এবার শিকার হয়েছে। এই ভাবেই দুরাত্মারা শাসন কায়েম করে। পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম 'বাঁড়ুজ্যেতলা শ্মশান'। শাসকের নির্লজ্জ মুখ এখানে প্রতিদিন স্পষ্ট হয়।

ভোটপর্বে শ্মশানের ত্রিকোণমিতিতে ছিল প্রশাসন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন আর পুলিশ। যা ভেবেছিলাম ভোটে তাই ঘটেছে। ৩৫৫ ধারা চালু করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে তৃণমূলের ভৈরববাহিনী আর পুলিশ। ৩৫৫ ধারা চালু করার দায়িত্ব ন্যস্ত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ওপর। নাহলে গণতন্ত্রকে হত্যার জন্য মানুষ তাঁকে দায়ী করবেন। ভোটপর্বে শাসকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাঁর তর্জন গর্জনই শোনা গিয়েছে তবে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে তিনি সেই মেঘ যে কেবল গর্জায় না বর্ষায়ও বটে। একসময় বিরোধী নেত্রী মমতার মঞ্চে সিপিএম তাড়ানোর জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গান ব্যবহার হতো— 'ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও' আর 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'। কবিগুরুকে কলঙ্কিত করে তাঁর লেখা যথেচ্ছ ব্যবহার করা রাজনীতিবিদদের বহুদিনের ব্যবসা।

এটা মেনে নিতেই হবে এ রাজ্যের প্রথম বিরোধী দল বিজেপি বাঙ্গালি জাতির আবেগকে এখনও ব্যবহার করতে শেখেনি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি-কে বাঙ্গলা বা বাঙ্গালির দল হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে যে ধরনের প্রয়াসের প্রয়োজন তার স্পষ্ট অভাব হয়েছে। একটি গোপন দলিলে বিজেপিকে 'বাংলা আর বাঙ্গালির' সাংস্কৃতিক দল বানানোর আহ্বান জানিয়েছেন দলের রাজ্য সাংস্কৃতিক সেলের আহ্বায়ক অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। তবে শুনেছি 'ভিশন বেঙ্গল (২০২৪-২০২৬)' নামে দশপাতার ওই দলিল তামাদি হতে বসেছে। কারণ ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্য আর কেন্দ্রের এক নেতা অন্য কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ কষছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রেখে যাওয়া বাঙ্গালি জাতির উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা বাসনা তাদের নেই যদিও রাজ্যের বুকে সেই পরিবেশ তৈরি রয়েছে।

এ লেখা যখন ছাপা হবে পঞ্চায়েত ভোটের ফল প্রকাশিত হয়ে যাবে। গত দশ বছরে পঞ্চায়েতে সর্বোচ্চ ৮২ শতাংশ ভোট যে মমতার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষত শাসকের এই সীমাহীন সন্ত্রাসের মুখে। আর তা না হলে এটা মানতেই হবে যে এ রাজ্যে ভোট মানে প্রহসন যার প্রধান ভাগিদার শাসক। তৃণমূল বড়ো আকারে জিতলে মেনে নেব মমতা ম্যাজিক জানেন। ২০০৮-এর পঞ্চায়েত ভোট সিপিএম-এর চলে যাওয়ার ইঙ্গিত রেখেছিল। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোট মমতার পতনের কোনো ইঙ্গিত রাখে কি না সেটাই দেখার। বিরোধিরা অন্তত ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ (২৫-৩০ হাজার) আসন জিততে পারলে আগামী ভোটগুলিতে মমতার পতন অবশ্যম্ভাবী। মমতার তাৎক্ষণিক নীরবতাই তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। হয় তিনি ধরে নিয়েছেন তৃণমূল অনায়াস জিতে গিয়েছে নয়ত আসন্ন ঝড়ের আন্দাজ পেয়েছেন। অনুমান হচ্ছে বিজেপি উত্তরবঙ্গের দুটি জেলা পরিষদ কোচবিহার আর আলিপুরদুয়ার দখল করবে আর বাম-কংগ্রেস কেবল মুর্শিদাবাদ জেলা।

উচ্চ ভোট দানের মাত্রা থেকে আপাতত ধারণা হচ্ছে যে বাঙ্গলার অনেকটা রাজনৈতিক জমি বিরোধীরা আয়ত্তে এনে ফেলেছে। বারো বছর ধরে মমতা বিষবৃক্ষ পুঁতছেন। সহজে তা উপড়ে ফেলা কঠিন। কেবল 'পিস রুমের' রাজনীতি করলে সে বিষবৃক্ষ বেঁচে যাবে। পতনের বীজ মমতা নিজে পুঁতেছেন তাই তাঁকে সরতেই হবে। মমতার 'জিয়ন আর মরণ কাঠি' রয়েছে রাজার হাতে। ক্ষমতাহীন রাজা আর ফলহীন বৃক্ষ দুই সমান। রাজাকে রাজ্য নির্বীষ করতে হবে। রাজ্যের জনগণ রয়েছেন তার প্রতীক্ষায়। □

বারো বছর ধরে মমতা বিষবৃক্ষ পুঁতছেন। সহজে তা উপড়ে ফেলা কঠিন। কেবল 'পিস রুমের' রাজনীতি করলে সে বিষবৃক্ষ বেঁচে যাবে। পতনের বীজ মমতা নিজে পুঁতেছেন তাই তাঁকে সরতেই হবে।

ইউক্রেনকে হারিয়ে এগিয়ে বাংলা জয় দিদিরাজের জয়

রণনেত্রীষু দিদি,

আপনি আর আমি এক হয়ে রইলাম এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে। শহুরে ভোটার হওয়ায় দু'জনেরই ভোট ছিল না। সত্যি বলছি, দিদি সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনায় আমিও কোমরে চোট পেয়েছি। ফলে আপনার মতো অ্যামিও বাড়িতে বসে টিভিতে ভোটপর্ব দেখলাম। তার পরে অনেক অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই চিঠি লিখতে বসলাম। আর মনে মনে বলেই ফেললাম, এই যুদ্ধের 'রণনেত্রী' আপনিই।

ভোটের ফল নিয়ে আমি কিছু বলব না। যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে। জয় দিদিরাজের জয়। কিন্তু ভোটের ফলা নিয়ে কিছু বলার রয়েছে। সত্যিই দিদি, আপনার স্লোগান 'এগিয়ে বাংলা' মিলে গিয়েছে। ভোটগ্রহণের দিন মানে ৮ জুলাই ইউক্রেনে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। আর আপনার, আমার বাংলায় ওই একই দিনে মৃত্যু ১৮ জনের। আপনি হয়তো বলবেন আপনার দলের লোকেরাই বেশি খুন হয়েছে। কিন্তু আমি বলব, আমার বাংলার প্রায় ৫০টা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ভোট।

কী দরকার এমন ভোটের? স্বাভাবিক ভোট হলেও আপনিই এগিয়ে থাকতেন। এটাই সত্য। আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর জোরেই তো এগিয়ে থাকতেন। হয়তো এমন নিরঙ্কুশ শক্তি পেতেন না। কিন্তু যেটা পেতেন সেটা হলো বাংলার মন। জানতে পারতেন কোন এলাকায় আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও বেশি করে সংগঠনে মন দিতে হবে। কিন্তু এখন যা দাঁড়াল, তাতে আপনাকে ভাবতে হবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কোন কোন জায়গায় পেশিশক্তি আরও বাড়াতে হবে। কোথায় কোথায় বিরোধীদের আটকাতে, নিরপেক্ষ ভোটারদের আটকাতে কী কী কৌশল নিতে হবে।

বাম আমলেও এমন হয়েছে। অন্য রাজ্যেও অতীতে এমন দেখা গিয়েছে। কিন্তু দিদি, এমন হিংসাবহুল নির্বাচন এখন ভারতের কোনও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় না। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন ফের গোটা দেশের নজর কাড়তে সক্ষম হলো। দোহাই দিদি, এবার একটু ভাবুন বাংলার কথা। আপনার ভাই হিসেবে এটুকুই চাওয়া। অন্য রাজ্যে আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়রা রয়েছেন। তারা বলছেন বাংলায় নির্বাচন চলছিল, না কি যুদ্ধ, অস্ত্রের বহর দেখে তা বোঝা মুশকিল। মনে পড়ছে দিদি, বগটুইকাণ্ডের পরই আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজ্যে যেখানে যত বেআইনি অস্ত্র আছে, সব বাজেয়াপ্ত করতে হবে। কিন্তু কোথায় কী? আমার অবাক মনে প্রশ্ন, রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করার মতো সাহস পুলিশ-প্রশাসনের আদৌ থাকতে পারে কি? মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের উপর দিয়ে যেতে পারে, এমন কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্র রাজ্যে তৈরি হয়েছে কি? স্থানীয় স্তরের নেতাদের উপরে আপনার মানে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছে কি? মোট কথা যেটা বুঝলাম, নির্বাচনে এমন রক্তক্ষয় এড়ানোর কোনও উপায় রাজ্য প্রশাসন করে উঠতে পারেনি। সেই লজ্জা রাজ্য প্রশাসনকে বহন করতে হবে। রাজ্যবাসীকেও। নির্বাচন কমিশনার তাঁর গোঁফ আর ঝুলপি সামলাতেই ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু দিদি, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আপনিও কি কোনও মতে দায় এড়াতে পারেন? এমন প্রশ্নের জন্য অপরাধ নেবেন না দিদি। বাড়িতে আপনার ভাইয়েরা যেন সাদা থান না পাঠিয়ে দেয়। একটু দেখবেন দিদি!

দিদি, আপনি অতীতের উদাহরণ দিতেই পারেন। বিশেষ করে বাম জমানার। কিন্তু দিদি, বাম জমানা শেষ হওয়ার ১২ বছর তো পার হয়ে গিয়েছে। আর বাংলা সেসব চায় না বলেই তো আপনাকে ক্ষমতায় এনেছে এবং রেখেছে। তবুও দিদি প্রশ্ন, এর আগে পুলিশকে, ভোট কর্মীকে, মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারকে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে হাউহাউ করে কাঁদতে দেখেছে বাংলা? কোনওদিন শোনা গিয়েছে অসহায় পুলিশকর্মী বিরোধী দলের নেতারা কাছে গিয়ে বলছেন— 'আমাকে বাঁচান, সরিয়ে দিন।'

আসল সত্য কি জানেন দিদি? সত্য এই যে, বাংলায় নির্বাচনী হিংসার পরম্পরাটি এই জমানায় চরম আকার নিয়েছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে হিংস্র রাজনীতি নিরবচ্ছিন্ন প্রমত্ততায় গণতন্ত্রের কাঠামোয় প্রবল আঘাত চালিয়েছে। ভোট মিটলেও সেই তাণ্ডবের অবসান হবে না জানি। রক্তস্রোত এবং প্রাণহানি থামবে না। ঘরছাড়া হয়ে থাকবে বিরোধী দলের অনেক কর্মী। ভয় পাচ্ছি, যেখানে যেখানে বদল এসেছে, সেখানে বদলার রূপ কেমন হবে সেটা ভেবে।

দিদি, আপনারা বলছেন, গোলমাল তো কয়েকটা বিচ্ছিন্ন জায়গায়। কিন্তু সেসব ছেঁদো কথা কেউ শুনতে চায় না। মনে রাখুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চায়, শেষ হোক দুঃশাসনের পালা। □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

মহারাষ্ট্রে তিন দল একত্রিত মানেই কোনো মহাজোট নয়

অজিত পাওয়ারের এনডিএ জোটে আসা অবশ্যই ত্রিমুখী মহারাষ্ট্র আগাড়ীর সঙ্গে মোকাবিলায় যথেষ্ট ঢালের কাজ করবে।

অজিত পাওয়ারের এনডিএ-র অংশীদার হয়ে যাওয়া কখনোই তাঁর শেষ রাজনৈতিক চাল নয়। অবশ্যই এনসিপি থেকে রাজনৈতিক ঘর বদল ২০২৪-এর নির্বাচনে তাঁর ও বিজেপি উভয়েরই সুবিধে করবে। ভারতীয় রাজনীতির নীতিগত অনিশ্চয়তা (দলগুলির) বিশেষ করে ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলির কর্ণধারদের ব্যক্তিগত উচাকাঙ্ক্ষা ও অনেক সময় নির্বাচনী ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধে পাওয়ার প্রশ্নে তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ অনায়াসে ভেসে যায়। মহারাষ্ট্রে এটিই আবার প্রদর্শিত হলো। এনসিপি থেকে বেরিয়ে আসা একটি অংশ ইতিমধ্যেই বিজেপি ও শিবসেনা থেকে বেরিয়ে আসা একটি নবজন্মপ্রাপ্ত শিবসেনা দলের (শিণ্ডের) সঙ্গে যোগ দিল। এনসিপি-র এই অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বধারী অংশ বর্তমানে শাসনরত জোটটিকে ত্রিমুখী করে তুলল। তাতে কার কী আদর্শ তা আর মূল বিচার্য রইল না। এই ত্রিমুখী জোট বিধানসভায় এখন ত্রিমুখী বিরোধী জোটের মুখোমুখি।

বেশ কিছুদিন ধরেই এনসিপি-তে শরদ পাওয়ারের ভাইপো নিজেকে আরও উচ্চাসনে দেখার জন্য ধৈর্য হারাচ্ছিলেন। শরদ পাওয়ারের অধীনে থাকা তাঁর অসহনীয় হয়ে উঠছিল। তাঁর মূল বাসনা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। ২০১৯-এ দেবেন্দ্র ফড়নবীসকে নিয়ে তাঁর যৌথ প্রচেষ্টা শরদ পাওয়ার ব্যক্তিগত আবেগপ্রবণ কৌশলে ব্যর্থ করে দিয়ে পুনরায় ভাইপোকে নিজের আওতায় ফিরিয়ে আনেন।

তবে এবারে সেই প্রত্যাবর্তন পর্ব সম্ভবত আর প্রদর্শিত হবে না, কারণ এতদিনে ভ্রাতুষ্পুত্র নিশ্চিত হয়েছেন যে দলের প্রধান হওয়ার জন্য তিনি আর লাইনে নেই। কাকার আশীর্বাদ ও পছন্দ এখন কন্যা সুপ্রিয়া সুলেতেই কেন্দ্রীভূত। এখন অনেকেরই মনে হতে পারে অজিত পাওয়ার ঠিক এই সময়টাতেই কেন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এনসিপি থেকে বেরিয়ে এসে বললেন তিনিই মূল। দল থেকে ছিটকে আসা গ্রুপ নয়। এসূত্রে তাঁকে ও তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গীদের অবশ্যই দলত্যাগ বিরোধী আইনকে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু হিসেবটা হচ্ছে এরকম। লোকসভা নির্বাচনের সময় মহারাষ্ট্র রাজ্য নির্বাচনের নির্ধারিত সময়কে যদি কিছুটা এগিয়ে আনা হয় সেক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ ছত্রছায়ায় শিণ্ডে-ফড়নবীশ জোটের সঙ্গে একত্রে তিনি একটি বড়ো ছাতার তলায় আশ্রয় পেয়ে যাবেন।

আজ যদি অজিত পাওয়ারের অধীনস্থ বিধায়কদের ডিসকোয়ালিফাই করা হয় তাহলেও তাঁরা ৬ মাস কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, তার মধ্যে রাজ্য নির্বাচনও এগিয়ে আসবে এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারের মওকাও দেখা দেবে। আবার বিজেপির তরফ থেকেও সময়টি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা বিহার ও মহারাষ্ট্রের বড়ো সংখ্যক সাংসদের আসন তাদের জেতা প্রয়োজন। এই দুই রাজ্যে ৪০ ও ৪৮টি আসন রয়েছে। কিন্তু এই তার জোটসঙ্গীরা কয়েক বছর ধরে এক ধরনের রাজনৈতিক বিশ্বাসে গভীরভাবে আক্রান্ত যে বিজেপির সঙ্গে থাকলে তাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল তো হবেই না, তাঁরা হারিয়েও যেতে পারেন। বিহারে নীতীশ কুমার ভাবছেন লালুর দলের সঙ্গে জোট বেঁধে লালুকে বিহার ছেড়ে দিয়ে তিনি দিল্লিতে নতুন ভূমিকা নেবেন। মহারাষ্ট্রে উদ্ভব ঠাকরে বিজেপি ছেড়ে এনসিপি, কংগ্রেস নিয়ে মহাবিকাশ আগাড়ীর জন্ম দিলেন। ত্রিশঙ্কু সংসদ হওয়া এখন নীতীশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি তালেগোলে প্রবীণ হিসেবে তাঁকে কেউ ডাকে। এক্ষেত্রে তাঁর কটা সাংসদ থাকবে সেটা তিনি বিশেষ বিবেচনায় আনছেন না।

২০২৪-এর এনডিএ-র দল বাড়াতে তাই বিহার ও মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোট বাড়িয়ে চলেছে। অজিত পাওয়ারের এনডিএ জোটে আসা অবশ্যই ত্রিমুখী মহারাষ্ট্র আগাড়ীর সঙ্গে মোকাবিলায় যথেষ্ট ঢালের কাজ করবে। এই সূত্রে বিহারে ছোটো ছোটো কয়েকটি দলের মাধ্যমে একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জিতন রাম মাজীর ছোটো দলিত গ্রুপ হিন্দুস্থান আওয়ামি মোর্চা (সেকুলার) ইতিমধ্যেই এনডিএ যোগ দিয়েছে। পঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশেও এই প্রক্রিয়া অগ্রসরমান। পঞ্জাবে প্রথম পছন্দ অকালি দল, অন্ধ্রে তেলুগু দেশম। অন্যদিকে কিছু কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে-এর লোকসভা নির্বাচনে জোট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

হ্যাঁ, মূল বিষয়ে ফিরে দেখতে হবে যে শারদ পাওয়ারের এনসিপি থেকে বেরিয়ে এসে অজিতের রাজনৈতিক লাভ বাস্তবে কতটা হলো। এখনই বেরিয়ে এসে যখন শরদ পাওয়ারের বেশ কিছু মাসের সময় হেসেখেলে হাতে রইল যখন তিনি কাছের লোকদের প্রভাবিত করে আজিতকে আবার দলে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। নিদেনপক্ষে অজিতের সঙ্গীদের মধ্যে অনেককে ফেরানোর চেষ্টা তো করতেই পারেন। অন্যদিকে শরদ প্রভু হলে অজিত কি আজীবনকাল প্রভুর প্রধান পার্শ্বচর হয়ে ঘুরবেন? যে কোনো ধরনের মন্ত্রীসভা গঠন হলেই দু'নম্বরে থেকে যাবেন, এক নম্বর হবেন না? এ প্রশ্ন অজিতকে তাড়িত করেছে।

অনেকে আবার অন্য একটি বিষয় তুলছেন যে এনডিএ-র তরফে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থাগুলির ওপর থেকে অজিত ও তার কিছু

বিধায়ক সঙ্গীর ওপর নজর হালকা করার সুযোগও থাকছে। বহু বিরোধী কড়া আওয়াজ তোলে যে যারা বিজেপির সঙ্গে হাত মেলায় তাদের বেআইনি কাজকর্মগুলি কিছুটা হালকা করে দেখা হয়।

না, এটি কোনো সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। কেননা কেউই চারটি রাজ্যের আসন্ন ভোটের কথা ভুলে যেতে পারেন না। সংসদীয় ভোট তো তার পরের বছর। সংসদের ক্ষেত্রে আসন্ন বিধানসভার ফল দেখে বিরোধীরা একত্রে ৪৫০টি আসনে বিজেপির বিরোধী প্রার্থী যদি দিতে পারে সেক্ষেত্রে ত্রিশঙ্কু সংসদের সম্ভাবনা থেকে যায়। হায়! তেমন পরিস্থিতি হলে অজিতের এই ঘর বদল করা আবার সঠিক পদক্ষেপ নাও হতে পারে। রাজনীতির খেলা চিরকালই ঝুঁকিপূর্ণ।

এরই মধ্যে অজিত পাওয়ারের দল বদলের যুক্তির যদি সমীক্ষা করা যায় তাতে তিনি মূলত তিনটি বিশেষ ভবিষ্যৎ ফলাফলের ওপর দাঁও খেলেছেন। (১) আজকের তারিখে তিনি একটি দলের সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পারছেন যা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ভাবমূর্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো অবস্থাতেই তাঁকে শরদ পাওয়ারের কাছে পরামর্শ চাইতে দৌড়তে হবে না। (২) ২০২৪-এর সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে এনডিএ-র কাছে যদি তাঁর রাজনৈতিক উপস্থিতি যথেষ্ট মূল্যবান হয় সেক্ষেত্রে তাঁর দল ছাড়ার সময়টি যথোপযুক্ত। তিনি তাঁর আদি দলের চেয়ে কী সংসদ কী বিধানসভা উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বেশি আসন পেতে পারেন। আর যদি এনডিএ ক্ষমতাসীন হয় সেক্ষেত্রে তাঁর সহকারীরা কেন্দ্রে কিছু পদও পেতে পারেন। সরাসরি অংশীদারিত্ব। (৩) এবার বিষয়টা কিছুটা পারিবারিক। শরদ পাওয়ার যে তাঁর কন্যাকে দলে একবারে অধিনায়কের পদে বসিয়েছিলেন সেখান থেকে দৃশ্যত কিছুটা ভুল হিসেবনিকেশ যে হয়েছে তা প্রমাণিত হবে। প্রথমত শিণ্ডে ও উদ্ধব ঠাকরেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের নিরসনে সর্বোচ্চ আদালত তাঁর রায়ে বলেছেন যে দলগত প্রধানই বিধায়কদের মধ্য থেকে চিফ হুইপ নিয়োগ করার অধিকারী বিধায়ক দল নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে অজিত পাওয়ার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শরদ পাওয়ার বা তাঁর মেয়ে সুলের নির্দেশিকার মধ্যে পড়ে যাবেন। যদিও তিনি নিজেই দলীয় প্রধান বলে ঘোষণা করেছেন। বাস্তবে মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য যারা উত্তরপ্রদেশের পরেই সর্বোচ্চ সংখ্যক সাংসদ ৪৮ জনকে সংসদে পাঠায় সেখানে একটি তিন দলীয় জোটের সঙ্গে আর একটি তিন দলীয় জোটের লড়াই কিছুটা অস্থির রাজনীতির জন্ম দেয়। মহারাষ্ট্রে তা ঘটতে পারে। অজিত পাওয়ার আবার উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ঠিকই তবে সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এটাই যে তাঁর শেষ চাল এমনটা নাও হতে পারে। তাঁর ওপর নিশ্চিতভাবেই মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের ওপর যখন তা হবে। কোনো ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে সেক্ষেত্রে সেটিই হবে তাঁর পক্ষে সেরা সুযোগ। □

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ- ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুট এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন-প্রাণায়াম-মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাজ (যোগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল : ১ বছর। ৩০ জুলাই থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা : ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস : প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ
1977
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi -, Govt,. of India

কোর্স ফি : ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা।
ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস : ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯
9051721420 / 9830597884/9836522503

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

খালিস্তানি জঙ্গি-কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ ভারতের

খালিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী এখন ভারতের সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ। এই জঙ্গিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ইউরোপ-আমেরিকার মতো জায়গায় থাকায় ভারতীয় প্রশাসনের পক্ষে এককভাবে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে ভরসা মোদী সরকারের কূটনৈতিক দৌত্য। প্রসঙ্গত, গত মার্চেই ইংল্যান্ডের ভারতীয় দূতাবাসে আক্রমণ চালায় খালিস্তানিরা। ইংল্যান্ডের মাটিতে খালিস্তানি জঙ্গি-কার্যকলাপ রুখতে তাই ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের দাওয়াই— এক, ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দোষীদের কড়া শাস্তি দিতে হবে। দুই, দরকার পড়লে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্তও নিতে হবে ব্রিটেনের প্রশাসনকে। সম্প্রতি উভয় দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠকে খালিস্তানি জঙ্গি রুখতে এমনি দাওয়াই দেন তিনি। দিল্লির এই বৈঠকের সুত্রেই সংবাদমাধ্যমের থেকে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে, ভারত-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেছেন দোভাল।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় দূতাবাসে হামলার পরে ভারতের জাতীয় পতাকা ফেলে দিয়ে সেখানে ওড়ানো হয় খলিস্তানিদের হলুদ পতাকা। এরপর থেকেই সেদেশে ক্রমশ বাড়ে খলিস্তানি কার্যকলাপ। ব্রিটেনে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামীর উদ্দেশে হুমকিও দিয়েছে ব্রিটেনের খালিস্তানিরা। গত ৮ জুলাই ভারতের হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ মিছিলও করে তারা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বৈঠক করেন ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও ইংল্যান্ডের নিরাপত্তা উপদেষ্টা টিম বারো।

দুই দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদেশ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'ভারত বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে ব্রিটিশ সরকারকে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সাফ জানিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে দেশ থেকে অপরাধীদের বের করে দেওয়ার মতো কড়া শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।' সূত্রের খবর, এই ঘটনায় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে ভারত খুবই চিন্তিত। এনিয়ে আগেও ব্রিটিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত বৈঠকে কড়াভাবেই বার্তা দিয়েছেন অজিত দোভাল।

গত ৬ জুলাই ব্রিটেনের বিদেশ সচিব জেমস ক্লেভারলি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভারতীয় কূটনীতিকদের উপর হামলা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বৈঠকের পরে ব্রিটিশ নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেছেন, গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় হিংসাত্মক আচরণের কোনও জায়গা নেই। ৮ জুলাই ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ আপাতত দক্ষতার সঙ্গেই সামলেছে ব্রিটিশ-প্রশাসন, ভারতের কড়া নজরও ছিল সেদিকে। বড়ো ধরনের কোনো অশান্তির খবর আপাতত নেই। তবে খালিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী নিয়ে ভারতের এই উদ্বেগ নতুন কিছু নয়। এর আগে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপ-সহ বেশ কিছু অভিযোগে বিদেশে থাকা ষোলো জন খালিস্তানি জঙ্গির বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। অভিযুক্তরা আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন।

এনআইএ-র চার্জশিটে বলা হয়েছিল, খালিস্তান গঠনের জন্য একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে ওই ষোলোজন যুক্ত রয়েছেন। তাঁরা রাষ্ট্রদ্রোহের মতো কাজকর্ম এবং ধর্ম ও আঞ্চলিকতাবাদকে ভিত্তি করে শত্রুতা ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে সাতজন আমেরিকায়, ছ'জন ব্রিটেনে এবং তিনজন কানাডায় থাকেন। চার্জশিটে থাকা অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন গুরপতওয়ান্ত সিংহ পন্নু, হরদীপ সিংহ নিজ্জর ও পরমজিৎ সিংহ। এই তিনজনকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আগেই জঙ্গি হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পন্নু রয়েছেন আমেরিকায়, কানাডায় রয়েছেন নিজ্জর ও ব্রিটেন রয়েছেন পরমজিৎ। এনআইএ সূত্রের খবর, অভিযুক্তেরা শিখ ফর জাস্টিস (এসএফজে)-এর সদস্য। সন্ত্রাস-বিরোধী আইনে এই সংগঠনটিকে আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এনআইএ-র মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, এসএফজে দাবি করে, তারা মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজকর্ম করে। কিন্তু আদতে এটি খালিস্তানপন্থী জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রকাশ্য সংগঠন। তিনি বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং ইউটিউবে এসএফজে ভারত-বিরোধী প্রচার চালায়।'

বছর তিনেক আগে উত্তরপ্রদেশের মিরাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এক খালিস্তানি জঙ্গিকে। এই জঙ্গিকে বহুদিন ধরেই খুঁজছিল পঞ্জাব পুলিশ। শেষ পর্যন্ত রবিবার উত্তরপ্রদেশ এটিএস ও পঞ্জাব পুলিশের যৌথ অভিযানে মিরাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম তিরথ সিংহ, বয়স ৩২ বছর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, এই ব্যক্তি খালিস্তানি আদর্শে অনুপ্রাণিত। জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গেও সে যুক্ত ছিল। তার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং হোয়াটসঅ্যাপে খালিস্তান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো বার্তা রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করার সময় তার জিজ্ঞাসাবাদ করে খালিস্তান আন্দোলন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গিয়েছিল।

সব মিলিয়ে খালিস্তানি জঙ্গি কার্যকলাপ যে এখন ভারতের মাথাব্যথার প্রধান কারণ তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। শিখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মোড়কে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পেছনে যে দেশের রাজনৈতিক একাংশের মদত রয়েছে, শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রে এই খালিস্তানি আন্দোলনকে কাজে লাগানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও খালিস্তানি আন্দোলন বড়োসড় বিপদের সংকেত দিচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। □

ইউনিফর্ম সিভিল কোড কোনোভাবেই মুসলমান বিরোধী নয়

সাধন কুমার পাল

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) মানে ধর্ম, বর্ণ বা জাতি নির্বিশেষে ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি অভিন্ন আইন। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গের জন্য একই আইন। সিভিল কোড কার্যকর হলে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তান দত্তক এবং সম্পত্তি ভাগের মতো বিষয়ে সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন নিয়ম থাকবে। এর লক্ষ্য বর্তমানে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন পারিবারিক আইন প্রতিস্থাপন করা যা ধর্মীয় ও লিঙ্গ পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়।

ভারতে পারিবারিক আইনের (পার্সোনাল ল) পার্থক্যের একটি উদাহরণ : বর্তমানে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে মহিলাদের অধিকার, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আলাদা আলাদা আইন রয়েছে। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অধীনে, (যা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে) হিন্দু নারীদের তাদের পিতা-মাতার কাছ থেকে হিন্দু পুরুষদের মতোই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সমান অধিকার রয়েছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত কন্যাদের অধিকার সমান এবং পৈতৃক সম্পত্তি ভাগের জন্য নারীরা যৌথ আইনগত উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত। মুসলমান ব্যক্তিগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মুসলমান মহিলারা তাদের স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ পাওয়ার অধিকারী যা সন্তানের সংখ্যার উপর নির্ভর করে হয় ১/৮ বা ১/৪ অংশ। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অংশ অর্ধেক। খ্রিস্টান, পার্সি ও ইহুদিদের জন্য ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য। খ্রিস্টান মহিলারা শিশু বা অন্যান্য আত্মীয়দের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি পূর্বনির্ধারিত অংশ পান। পার্সি বিধবারা তাদের সন্তানের সমান অংশ

পায়, সন্তানের অর্ধেক অংশ মৃতের বাবা-মা বেঁচে থাকলে তাদের কাছে যায়।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে যুক্তি :

(১) দেশে অভিন্ন ফৌজদারি বিধি চালু থাকলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কেন আপত্তি, এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে দেশ জুড়ে। এ প্রসঙ্গে, উল্লেখ করা যায় পঞ্চাশের দশকে হিন্দু কোড বিলের আমূল সংস্কার করা হয়েছে।

(২) স্বাধীনতার পরেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে সংবিধান সভায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু সভায় শেষ পর্যন্ত ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদটি গৃহীত হয়, তবে বিধির প্রণয়ন ও প্রয়োগের দায়িত্ব ভবিষ্যতের সংসদ ও সরকারের উপরে ন্যস্ত হয়। Article 44 in Directive Principles of State Policy States that 'The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of india' স্বাভাবিকভাবেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রণয়ন একটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি, যা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পালিত হয়নি।

(৩) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখন প্রায় ১৫টি পারিবারিক আইন চালু রয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতে বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন আইন এবং বিবাহ আইন রয়েছে। এ কারণে সামাজিক কাঠামোর অবনতি ঘটেছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হলে সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। এই কারণেই দেশে একটি অভিন্ন সিভিল কোডের দাবি উঠেছে যা সমস্ত জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে এক ব্যবস্থার আওতায় আনবে। একটি কারণ বিভিন্ন আইনের কারণে বিচার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে লোকেরা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়গুলির নিষ্পত্তির জন্য ব্যক্তিগত আইন বোর্ডের কাছে যায়। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হলো ড. আম্বেদকর দ্বারা কল্পনা করা সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে নিরাপত্তা প্রদান করা, যার মধ্যে নারী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রয়েছে, সেইসঙ্গে ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে মজবুত করা।

(৪) ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। একাধিক মামলায় সুপ্রিম কোর্টও বিধি চালু করার কথা 'ভাবতে' বলেছে কেন্দ্রকে। কিন্তু কোনও স্পষ্ট নির্দেশ দেয়নি।

(৫) শাহবানো মামলায়, আদালতের পর্যবেক্ষণ হলো যে ধারা ৪৪ একটি 'মৃত চিঠি' ('dead letter')-তে পরিণত হয়েছে এবং আদালতের আরও সংযোজন একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইন 'বিরোধপূর্ণ মতাদর্শ রয়েছে এমন আইনের প্রতি আনুগত্য দূর করে জাতীয় সংহতির কারণকে' সাহায্য করবে। এতে বলা হয়েছে যে দেশের নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন নাগরিক বিধি সুরক্ষিত করার দায়িত্ব আইনসভার উপর অর্পিত।

(৬) ১৯৯৫ সালে সরলা মুদগল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীকে অনুচ্ছেদ ৪৪ পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিল,

যার লক্ষ্য সমগ্র ভারতে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রতিষ্ঠা করা।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে অপপ্রচার :

এক শ্রেণীর মানুষ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ইস্যুটিকে মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে 'হস্তক্ষেপ' এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত বলে অভিহিত করে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। মানুষ ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য অপপ্রচার চালিয়ে বলা হচ্ছে যে এই আইন চালু হলে মুসলমানরা তাদের মৃতদের কবর দিতে পারবে না এবং তার পরিবর্তে দাহ করতে হবে, তাদের বিয়ের সময় হিন্দু রীতি মেনে চলতে হবে, মাথায় ফেজ টুপি পরতে পারবে না এবং তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে শুধুমাত্র বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরণপোষণ এবং উত্তরাধিকারের মতো বিষয়ে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমতার বিধানের কথাই বলা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, সমাজের বিভিন্ন অংশের (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, লিঙ্গায়েত), অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি অনেক উপজাতি সমাজেও প্রযোজ্য হবে।

ফৌজদারি আইন সবার জন্য এক হলেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে ভয় কেন? : এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো যে ফৌজদারি আইন, যা সমস্ত ভারতীয়দের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং একজন মুসলমানের বিশ্বাস ও আস্থাকে প্রভাবিত করে না, সেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ করা হলে ইসলাম-সহ যে কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস কীভাবে বিপন্ন হতে পারে?

ইসলামি শরিয়া আইন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি : প্রায়শই আরেকটি যুক্তি দেওয়া হয় যে মুসলমানদের শরিয়া আইনে সংস্কারের কোনো সুযোগ নেই এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে, তাদের পারিবারিক আইন শুধুমাত্র শরিয়ার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। ইতিহাস বলছে বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে ইসলামি শরিয়া আইনে সংশোধন করা হয়েছে। যেমন খলিফা উমরের শাসন আমলে, যখন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তিনি শরিয়া আইন অনুযায়ী চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার বিধান স্থগিত করেন। উল্লেখ্য যে, এই শাস্তির কথা কোরানেও উল্লেখ আছে। তারপরও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে সমন্বয় করা হয়েছে। শরিয়া আইন শুধুমাত্র দেওয়ানি বিষয় নয় বরং দণ্ডবিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে চুরির জন্য হাত কেটে ফেলা এবং ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যার মতো গুরুতর শাস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক-সহ ইসলামি রাজ্যে বসবাসকারী অনেক মুসলমান শরিয়া আইন মেনে চলেন না। ইতিমধ্যে অমুসলমান রাজ্যে বসবাসরত মুসলমানরা দেওয়ানি ও দণ্ডবিধিতে দেশের আইন মেনে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সহ-নাগরিকদের মতো ফৌজদারি বিষয়ে শরিয়া আইন অনুসরণ করেনি এবং পরিবর্তে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) অনুসরণ করেছে।

সাংস্কৃতিক আক্রমণের ভীতি : অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ করে মুসলমান, খ্রিস্টান-সহ সবাইকে বলপূর্বক হিন্দু রীতিনীতিতে নিয়ে আসার চক্রান্ত হচ্ছে এমন অপপ্রচার চালিয়ে ভয়ের পরিবেশ নির্মাণের প্রয়াস হচ্ছে। এই সমস্ত অপপ্রচারের পিছনে আসলে কোনো যুক্তি নেই। এই ধরনের অপপ্রচারকারীরা এই আইনে এমন একটি শব্দও দেখাতে পারবে না যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বা রীতিনীতিতে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে। বৌদ্ধ, জৈন, পার্শীরা এতদিন হিন্দু কোড বিলের আওতায় ছিলেন। আজ পর্যন্ত কেউ এমন একটি প্রমাণ দিতে পারবে যে হিন্দু কোড বিলের জন্য এই সম্প্রদায়গুলিকে তাদের নিজের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে বা রীতিনীতিতে কোনো রকম আঁচ পড়েছে।

বামেরা এক সময় পক্ষে ছিল কিন্তু এখন বিপক্ষে : জনসঙ্ঘের সময় থেকে বিজেপি ৩৭০ ধারা, রামমন্দিরের সঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করার বিষয়টি তাদের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির মধ্যে স্থান দিয়ে এসেছে। বিজেপির এই আদর্শগত অবস্থান সংবিধান প্রণেতাদের মানসিকতার সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু অন্যান্য সমাজবাদী দল ও বামেদের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বামপন্থীরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে জোরদার সওয়াল করতো। কিন্তু এখন ওরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করার বিপক্ষে কথা বলছে। ১৯৮৬ সালে শাহবানু মামলায় কেন্দ্রের অবস্থানের বিরুদ্ধে গিয়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে জোরদার সওয়াল করে আরিফ মহম্মদ খান (বর্তমানে কেরালার রাজ্যপাল) রাজীব গান্ধী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সে সময় বামপন্থী-সহ বিভিন্ন সমাজবাদী দল আরিফ মহম্মদ খানের এই অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা মূলত দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা, যা অতীতে ভারতের উন্নয়নে বাধা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে দেশের জন্য একটি যথাযথ দেওয়ানি বিধি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইসলামি বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আরও ভালো নাগরিক আইন। সংবিধান বিশেজ্ঞরাও বলছেন UCC (Uniform Civil Code) is part of Part-IV of the Constitution which includes the Directive Principles of State Policy (DPSP). Article 44 in DPSP state that 'The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India'.

বেশ কয়েকবার, এই জাতীয় আইনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়ার সময়, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে এর জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু সেগুলি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরে দেরিতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। সংকীর্ণ রাজনীতির বৃত্তের বাইরে এসে এই আইনকে সমর্থন করলে দিকে দিকে আওয়াজ উঠবে এক দেশ, এক আইন, এক লক্ষ্য যা ভারতীয় সভ্যতার যে মূল মন্ত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর ফলিত রূপকে সাকার করে তুলবে। ▯

ভারতে মুসলমানদের আরবীয়করণের প্রক্রিয়া স্বাধীনতার আগে থেকে চলছে

বিনয়ভূষণ দাশ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এক দিক্‌নির্ণায়ক, যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিদ্রোহ পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, আবার এই বিদ্রোহের নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে। এই বিদ্রোহে উত্তরভারতের বিজনোর, বেরিলি, মিরাট, মোরাদাবাদ, অযোধ্যা, সাহারানপুর, নাজিরাবাদ, রোহিলখণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমান ভূস্বামী ও সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা এই সুযোগে ভারতবর্ষে আবার মুঘল শাসন পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, Muslim leaders and Moulavis were fired by the ambition of restoring Muslim rule in India.

এই বিদ্রোহ বাঙ্গলার বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে শুরু হলেও পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের মিরাট ও অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমান ভূস্বামী ও সিপাহিরা নানা ইসলামি অনুষঙ্গ নিয়ে আসে বিদ্রোহের মধ্যে। তাঁদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে, 'খাল্ক্ খুদা কি, মুলক্ বাদশাহ কা; হুকম্ সিপাহী বাহাদুর কা।' এঁরা ভারতে পুনরায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ অবধি মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় এই শ্রেণীর মুসলমানরা হতাশ ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, যেহেতু এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার জন্য এই দেশ আবার 'দারুল ইসলামে' পরিণত হলো না, তাই মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বাবা মৌলানা খয়রুদ্দিন ভারত থেকে পালিয়ে মক্কায় বসতি স্থাপন করে। বিদ্রোহ ব্যর্থতার পরে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দুটি ভিন্নমুখী ধারার সৃষ্টি হয়। একটা ধারা মহাবিদ্রোহে ইংরেজ পক্ষের সোচ্চার ও সক্রিয় সমর্থক। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ ও ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুহমেডান অ্যাংলো- ওরিয়েন্টাল কলেজ' যেটি পরবর্তীকালে 'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে রূপান্তরিত হয় সেটি এই ধারার অন্তর্গত। এই ধারাটি আবর্তিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা পাকিস্তান আন্দোলনের সূতিকাগৃহ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য ধারাটি উদ্ভূত হয় একই রাজ্য থেকে। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার এক গণ্ডগ্রাম, দেওবন্দ থেকে। ওই গ্রামের এক নিভৃত কোণের এক ডালিমগাছের তলায় বসে ছ'জন প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া মুসলমান 'দারুল-উলুম-দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের একমাত্র সহি আরবিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ইলমে হাদিস ও ইলমে তাফসিবের মাকবুল এবং অনন্য দরগাহ হিসেবে। এটি আউলিয়ায়ে কেরাম এবং মাশারিখে হিন্দের একমাত্র কহানি দীক্ষাগার।

'দেওবন্দ' অনুগামীরা আলিগড়পন্থীদের মতো দেশভাগ করে পাকিস্তান চায়নি; কিন্তু তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষকেই ইসলামীকরণ করতে চেয়েছিল। দেওবন্দ অনুসারী আধুনিক ইসলামি কট্টরবাদের প্রধান তাত্ত্বিক মৌলানা মউদুদি ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলামে' রূপান্তরিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন।

এঁরা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় ভাবধারার প্রচণ্ড বিরোধী। যা কোরান ও হাদিসে নেই এমন সমস্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এঁরা চরম বিরোধী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁদের মতবাদ হলো, 'ভারতবর্ষ হলো দারুল হারব' (অর্থাৎ শত্রু কবলিত দেশ); মুসলমানদের শাসনকালে যে দেশ 'দারুল ইসলামে' রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এঁরা 'হিন্দুয়ানা সম্পৃক্ত' এবং ইসলামবিরোধী বলে গণ্য করে তাকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করে। দেওবন্দপন্থীরা সর্বদাই গুরুত্ব দিয়েছে গোঁড়া ইসলামপন্থার উপর। পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সে আন্দোলন থেমে যায়নি, বরং ক্রমবর্ধমান। মুসলমানদের ইসলামীকরণের নামে তাঁরা 'আরবীয়করণের' উপর জোর দিয়েছে। তাঁরা আরবে উদ্ভূত 'ওয়াহাবী পন্থায়' বিশ্বাসী। এঁদের মতে, ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব শুরু হওয়ায় এদেশ আবার 'শত্রু কবলিত দেশ', অর্থাৎ 'দারুল হারবে' পরিণত হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের 'ফরজ' অর্থাৎ পবিত্র কর্তব্য হলো এ দেশকে 'কাফির' অর্থাৎ মূর্তি-পূজক ('প্যাগান')-দের হাত থেকে স্বাধীন করা, একে 'দারুল ইসলামে' রূপান্তরিত করা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হজরত মৌলানা কাসেম নানুতুবি, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, হাজি আব্দেদ হুসেন প্রভৃতি ব্যক্তি। এঁরা এমনকী উত্তরপ্রদেশের একটি ছোট্ট ভূখণ্ডে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

যাইহোক, এঁদেরই এক অনুগত শিষ্য মৌলানা কাসিম নানুতুবির নেতৃত্বে ছ'জনের

একটি গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 'দারুল-উলুম- দেওবন্দ', ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে, মতান্তরে ৩১ মে। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে। এই আঠারোটি নীতির মধ্যে আমি দু-তিনটে নীতির উল্লেখ করছি। এঁদের একটি অন্যতম নীতি হলো, ব্যাপকহারে ছাত্র ভর্তি করে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে আধিপত্যবাদী 'প্যাগান' (মূর্তিপূজক অর্থাৎ হিন্দু) এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' বা 'ধর্মযুদ্ধ' পরিচালনার জন্য সুশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠন করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করে সঠিক দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, আঠারোটি মূলনীতির মধ্যে 'ফতোয়া' জারি করার বিষয়টি নেই। অথচ, মাঝে মাঝে বিতর্কিত 'ফতোয়া' জারি করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটি সংবাদের শীর্ষে চলে আসে। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময়ে অখণ্ড ভারত আর দ্বিখণ্ডিত ভারত নিয়ে উলেমায়ে দেওবন্দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তখন শায়কুল ইসলাম শিবিরের আহমেদ উসখানি, মৌলানা জাফর আহমেদ উসমানী প্রভৃতি ব্যক্তি নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে 'শরিয়তি' শাসন কায়েম করার জন্য ওকালতি করেন। মৌলানা মাদানী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে থাকেন। এই মাদানী গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৮৫৭-র 'মহাবিদ্রোহ' পরবর্তী সময়ে মুসলমান ভদ্র শ্রেণী বা 'এলিট' শ্রেণী দুটি শিক্ষাকেন্দ্রকে ঘিরে তাঁদের বিদ্যাচর্চা চালু রেখেছে। একটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা; আর অন্যটি 'দেওবন্দ' কেন্দ্রিক মুসলমান ধর্মীয় শিক্ষা। দারুল-উলুম-দেওবন্দ শুরু থেকেই গোঁড়া ইসলামপন্থী। এটি আধুনিক চিন্তাভাবনা যেমন জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র--- এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এঁদের ধারণায় ইংরেজ রাজশক্তি এদেশে স্থাপিত হবার আগে মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষ ছিল 'দারুল ইসলাম', সুতরাং দেশটিকে আবার 'দারুল ইসলামে' ফিরিয়ে আনতে হবে। যদিও এখানে জ্ঞাতব্য যে, মধ্যযুগে, মুসলমান শাসনকালেও ভারতবর্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই ছিল, জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরণ সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে রূপান্তরিত করা যায়নি। ভারতের বৃহত্তর অংশ অমুসলমানই থেকে গেছে।

'দেওবন্দ' অনুগামীরা আলিগড়পন্থীদের মতো দেশভাগ করে পাকিস্তান চায়নি; কিন্তু তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষকেই ইসলামীকরণ করতে চেয়েছিল। দেওবন্দ অনুসারী আধুনিক ইসলামি কট্টরবাদের প্রধান তাত্ত্বিক মৌলানা মউদুদি ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলামে' রূপান্তরিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। যদিও, মৌলানা মওদুদি দেশভাগের পরে পাকিস্তানে বসবাস করেন ১৯৭৯ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় অবধি। পাকিস্তানের শাসনকে পুরোপুরি ইসলামীকরণের জন্য আন্দোলন করেন এবং তাঁর আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানি শাসক জেনারেল জিয়া 'ইসলামীকরণের' নীতি গ্রহণ করেন পাকিস্তানে।

আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে 'আলিগড়পন্থী' ও 'দেওবন্দপন্থী'দের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলামে' রূপান্তরিত করার নীতির ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। 'আলিগড়পন্থীরা' বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধ্যমে, একাধিক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ গঠনের মাধ্যমে মুসলমান রাজত্ব কায়েম করতে চায়; আর দেওবন্দপন্থীরা সমগ্র ভারতকেই ইসলামীকরণ ও আরবীয়করণের মাধ্যমে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। রূপায়ণের পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে তফাত নেই। আর দেওবন্দপন্থীরা এই লক্ষ্য পূরণের জন্য একদিকে দেশের ভেতর থেকে, অন্যদিকে দেশের বাইরে থেকে তাঁদের বিভিন্ন বিতর্কিত ফতোয়ার মাধ্যমে তাঁদের দেশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যায় নিঃশব্দে।

দেওবন্দ তাঁদের কার্যকলাপ বিভিন্ন ইসলামিক দেশ, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং আরও অনেক দেশে তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। দেওবন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র মাহমুদ হাসান 'জমিয়তুল আনসার' নামে এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে তোলে আর এই সংগঠনেরই অন্যতম সদস্য মৌলানা উক ইদুল্লাহ আফগানিস্তানে গিয়ে 'জুন জুল্লাহ্' নামে একটি সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলে। 'দারুল-উলুম-করাচীর' প্রতিষ্ঠাতা মুফতি শফিং রাহর দেওবন্দ মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত হয় দেওবন্দ 'সিলসিলার' মাদ্রাসা 'দারুল-উলুম-হাক্কানিয়াত'। এই মাদ্রাসায় এত বেশি তালিবান মুজাহিদ্দিন কমান্ডার পড়াশোনা করেছে যে, এই মাদ্রাসার মুহতামিম মৌলানা শামসুল হককে ফাদার অব তালিবান বলে ডাকা হয়। এই ভাবে পৃথিবীব্যাপী ইসলামি সন্ত্রাসবাদের জাল বিছিয়ে চলেছে দেওবন্দের 'দারুল- উলুম'। এঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিবরণ এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। বারান্তরে তা বলার চেষ্টা করব। শেষে শুধু একটি বিষয় বিবৃত করেই এ নিবন্ধের সমাপ্তি টানব। শুনে হয়তো অনেকেই অবাক হবেন যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এবং কয়েক বারের কংগ্রেস দলের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যুক্ত ছিলেন এই দারুল-উলুম-দেওবন্দের সঙ্গে। দেওবন্দের আদর্শ অনুসারেই তিনি কাজ করতেন, দেওবন্দের আদর্শ অনুযায়ী তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেওবন্দের মতো তাঁরও স্বপ্ন ছিল, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতই 'দারুল-ইসলামে' পরিণত হবে; আলাদা করে দেশভাগের প্রয়োজন নেই। ভারত উপমহাদেশ নিয়ে গবেষণা করা বিখ্যাত ঐতিহাসিক কোয়েনরাড এলস্ট্ এর কথায়, 'He rejected the Partition of India and foundation of Pakistan, not because he rejected the idea of a Muslim state but because he wanted all of India to become a Muslim state in time.' এলস্ট আরও লিখেছেন, But he retained his position of trust in Nehru's cabinet and continued his work for the ultimate transformation of India into a Muslim state. □

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিই হবে ইন্ডিয়ান সিভিল কোড

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্গত ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ও বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতি বিধানের স্বার্থে, লিঙ্গ সাম্য, বর্ণ সাম্য ও জাতি সাম্যের উদ্দ্যেশ্যে এবং এক দেশ, এক জাতি গঠনের লক্ষ্যে জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একটি ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের কথা প্রস্তাবিত হয়েছে। স্বাধীনতার এই ৭৫ বছর পূর্তির পর দেশজুড়ে এই বিধির প্রয়োজনীয়তা আজ প্রবল ভাবে অনুভূত হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে বিভিন্ন সময়ে ভারতে ইন্ডিয়ান পুলিশ কোড, ইন্ডিয়ান এডুকেশন কোড, ইন্ডিয়ান ট্যাক্স কোড, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইত্যাদি বলবৎ হয়েছে। তাই স্বাধীনতার অমৃতকাল উদ্‌যাপনের মুহূর্তে, বিবিধতার মধ্যে মহান অভিন্নতা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবিত এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দেশের আপামর নাগরিক সমাজের কাছে আগামীদিনে হয়ে উঠতে চলেছে ইন্ডিয়ান সিভিল কোড বা এক দেশ, এক দেওয়ানি বিধি।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ সমূহের মাধ্যমে ভারতের সব নাগরিকের, সব লিঙ্গের, সব জাতির, সব ধর্মের, সব বর্ণের ও সম্প্রদায়ের মানুষের সমানাধিকার, জীবনের অধিকার এবং মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক আদর্শকে সুদৃঢ় করার হাতিয়ার এই ভারতীয় দেওয়ানি বিধি বা ইন্ডিয়ান সিভিল কোড। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা বা আইপিসির মতো এই আইন হতে চলেছে আইসিসি বা ভারতীয় নাগরিক সংহিতা। ব্রিটিশ শাসনে বিভাজন ও শাসনের ভয়াবহ নিয়মে ভারতের অনেকগুলি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাদের পার্সোনাল আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও আইন ব্যবস্থার বেড়াজাল কাটিয়ে, এই বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠতে ভারতবর্ষকে সাহায্য করবে এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।

প্রস্তাবিত ইন্ডিয়ান সিভিল কোডের মূল বিষয় সমূহ :

(১) **বিবাহের বয়স :** ব্রিটিশ আমলে বা তারপরে খ্রিস্টান, পার্শি, মুসলমান সম্প্রদায়ের ম্যারেজ অ্যাক্ট থাকলেও স্বাধীন ভারতে প্রথমেই ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রণয়ন করলে অনেক সমস্যারই সমাধান হতো। সেই পথে না হেঁটে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ১৯৫৬ সালে হিন্দুদের জন্যে পৃথক হিন্দু কোড বিল নিয়ে এলেন। ভারতের অধিকাংশ ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যার বিবাহের বয়স ২১ ও ১৮ হলেও মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাদের পার্সোনাল ল অনুযায়ী কন্যার বয়স ৯ হলে তাকে বিবাহযোগ্যা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে কম বয়সি মুসলমান মেয়েদের প্রতি বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন প্রযুক্ত হয় না। প্রস্তাবিত ভারতীয় দেওয়ানি বিধিতে এই অসাম্য দূর হতে পারে। পুত্র-কন্যা সাবালক হলে তার নিজের বিবাহের বিষয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলি এই ক্ষেত্রে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে এবং দেশে বাল্যবিবাহ প্রথা সার্বিকভাবে রোধ করা সম্ভব হবে।

(২) **সব বিবাহের ক্ষেত্রে আইনানুগ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক :** আজ এই একবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক ডিজিটালাইজেশনের যুগে দাঁড়িয়ে যেখানে ভারতের অধিকাংশ নাগরিকের একটি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সুনিশ্চিত হয়েছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সব আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেন-দেন সম্ভবপর হচ্ছে, এমনকী আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সব রকমের সরকারি পরিষেবার সুবিধা অর্জন করছেন, সেই ক্ষেত্রে সব ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের প্রতিটি বিবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হলে আরও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত হবে। এতে একজন দম্পতি আইনগত ভাবেও সুরক্ষিত হবেন।

(৩) **ডিভোর্স বা তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ :** বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিচ্ছেদের গ্রাউন্ড এবং প্রসিডিওর (অর্থাৎ বিচ্ছেদের আইনি ভিত্তি এবং বিচ্ছেদের আইনি প্রক্রিয়া) এক ও সমান হতে হবে। এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আইন অনুযায়ী বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের নপুংসকতা থাকলে মেয়েরা, মেয়েরা সন্তান ধারণে অক্ষম হলে পুরুষেরা, স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে একজন কেউ দীর্ঘ দিন নিরুদ্দেশ থাকলে, এমনকী স্ত্রী বার বার কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারেননি— ইত্যাদির আধারে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের আইনি প্রণালী নানা ভাবে বলবৎ আছে। ইন্ডিয়ান সিভিল কোড প্রণয়ন হলে স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের নিকট আত্মীয়রা আইনজীবীদের সাহায্যে একযোগে একটি অভিন্ন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন এবং বর্তমানে ডিভোর্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশের সব নাগরিকের ওপর সেই আইনটি সেই ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযুক্ত হবে। বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায় বাদ দিলে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন সমাজের ডিভোর্সের প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ মেয়াদি বিষয়। ডিভোর্সের ক্ষেত্রে দুইপক্ষ একমত হলে এবং তাদের এই ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য একটা ন্যূনতম সময় বরাদ্দ হলেও পুরো আইনি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময়ের এই দীর্ঘসূত্রিতাকে ইন্ডিয়ান সিভিল কোডের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তিন তালাক পদ্ধতি আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা হলেও অন্য আরও চার ধরনের তালাকের পদ্ধতি বিদ্যমান। যেগুলি এখনো দেশজুড়ে ই-মেল, এসএমএস হোয়াটসঅ্যাপ ও কুরিয়ারের মাধ্যমে দেওয়া চলছে। তিন তালাকের ক্ষেত্রে তা ছিল ইনস্ট্যান্ট ট্রিপল তালাক। অর্থাৎ একেবারে একসঙ্গে তিনবার তালাক দেওয়া। আর এই বাকি চার ধরনের তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটির ব্যবধান ৩০ দিন। এই তালাকগুলি প্রতিটিই একতরফা। এই তালাকগুলির ক্ষেত্রে যিনি তালাক দিচ্ছেন তার ওপরে কোনোরকম দায়দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ বর্তায় না। তাই ভারতের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের যুক্তিসঙ্গত, সরলতর অভিন্ন আইনি প্রক্রিয়া অতি প্রয়োজনীয়।

(৪) **সন্তান দত্তক গ্রহণের অধিকার :** সব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের সন্তানহীন দম্পতির ক্ষেত্রে সন্তান দত্তক নেবার অধিকার এই দেওয়ানি বিধির মাধ্যমে আইনসিদ্ধ হবে। দেখা যায়, বিবাহিত দম্পতি সন্তানহীন হলে পুরুষ বা নারী পুনর্বিবাহ করছেন। কিন্তু তাদের কারুর মধ্যে সন্তান ধারণে অক্ষমতা থাকলে পুনর্বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। মুসলমান সমাজে দত্তক নেওয়া সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তির অধিকার থেকে হয় বঞ্চিত। এমনকী মুসলমান সমাজে একাধিক কন্যার পর পুত্র পাওয়ার জন্যে একাধিক পুনর্বিবাহের উদাহরণ দেখা যায়। তাই সবার ক্ষেত্রে সন্তান দত্তক নেওয়ার সমানাধিকার এবং এবং গ্রাউন্ডস্ অফ্ অ্যাডপশন (দত্তক গ্রহণের আইনি ভিত্তি) ও প্রসিডিওর অফ্ অ্যাডপশন (দত্তক গ্রহণের আইনি প্রক্রিয়া) সবার ক্ষেত্রে সমান ও সহজতর হওয়া এই প্রস্তাবিত ইন্ডিয়ান সিভিল কোডের মাধ্যমে সম্ভব।

(৫) **বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে খোরপোষ :** অন্য সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলাকালীন বা বিবাহবিচ্ছেদের পরে পুরুষের তরফে স্ত্রী ও সন্তানের প্রতিপালনের জন্য খোরপোষ দেওয়ার পদ্ধতি সিআরপিসি আইনের ১২৫ ধারা অনুযায়ী আইনসিদ্ধ। কিন্তু মুসলমান সমাজে ডাক মারফত তালাক দেওয়ার প্রক্রিয়া চললেও খোরপোষ আইনের এই ধারাটি এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। এর ফলে তালাকের অব্যবহিত পরে ইদ্দতের সময়টায় পুরুষ চাইলে তার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য কিছু দয়া করে অর্থ দিতে পারে। যা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একজন তালাক প্রাপ্ত মহিলা ও সন্তানের জীবন ধারণের পক্ষে চূড়ান্ত অপর্যাপ্ত। তাই প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মাধ্যমে সব জাতি-ধর্মের মানুষের জন্য অভিন্ন গ্রাউন্ডস্ অফ্ মেইন্টেনেন্স এবং প্রসিডিওর অফ্ মেইন্টেনেন্স বলবৎ হওয়া জরুরি।

(৬) উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তির আইনি অধিকার এই প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বলে সব জাতি, সমাজ ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সমান ও সহজ হয়ে উঠবে।

(৭) **হাম দো, হামারে দো :** দেশে ইন্ডিয়ান সিভিল কোড প্রণয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সার্বিক ভাবে সম্ভব হবে। একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হলে এবং দুই সন্তান গ্রহণের নীতি ও পরিবার-পরিকল্পনা সার্বিক ভাবে প্রণীত হলে বর্তমানে ১৪০ কোটি জনসংখ্যায় পৌঁছে যাওয়া ভারতবর্ষ আগামীদিনে জনবিস্ফোরণের হাত থেকে রেহাই পাবে এবং মানব-সম্পদের সুষ্ঠু বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের সমবণ্টন এবং সুষম ব্যবহার সম্ভব হবে।

উপরোক্ত আইনি বিধি সমূহের প্রতিটির ক্ষেত্রে, তা পালন না হলে বা আইনভঙ্গ করলে আইনভঙ্গকারীর উপযুক্ত আইনানুগ শাস্তির বিধান থাকতে পারে এই প্রস্তাবিত আইনে। সেই ক্ষেত্রে আইন ভঙ্গ করলে তা আইনের চোখে হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বা পানিশেবল্ অফেন্স।

এই ইন্ডিয়ান সিভিল কোড বলবৎ হলে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অজস্র অবৈধ, বেআইনি শরিয়া আদালত, দার-উল-কাজা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। পার্সোনাল আইনের অন্তরালে তালিবানি, জেহাদি ফতোয়ারাজ খতম হবে। মুসলমান নারী-সমাজ অর্জন করবে সমানাধিকার। ঘোর পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজ এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড ভারতীয় সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ইত্যাদি অনুচ্ছেদ দেখিয়ে তাদের ব্যক্তিগত আইনকে 'নন-নেগোশিয়েবল্ রাইট' আখ্যা দিয়েছে এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের ব্যাপারে তাদের তীব্র আপত্তি জানিয়ে ল' কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে তারা এই দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের তরফে সংখ্যালঘু সমাজের ওপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া একটি আইন ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা বলে জানিয়েছে। শরিয়তের ঊর্ধ্বে উঠে এই আইন তারা মানতে রাজি নয় বলেও মতপ্রকাশ করেছে। এই সংক্রান্ত একাধিক জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে চলছে। ভারত সরকারের আইন মন্ত্রক সম্প্রতি হলফনামা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে সঠিক সময়ে পার্লামেন্টে এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আইন আনার বিষয়টি সরকার পর্যালোচনা করছে। ল' কমিশন অফ্ ইন্ডিয়া দেশের সব নাগরিক, সব সরকারি- বেসরকারি সংগঠন, সব ধর্মীয় সংগঠন, সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানিয়েছে এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করতে। গোয়াতে ১৯৬২ সাল থেকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলবৎ আছে। আজ পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়ের তরফে সেই রাজ্যে কোনো অসন্তোষের দৃষ্টান্ত নেই। উত্তরাখণ্ড সরকার সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডে এই বিল আনার প্রস্তুতি শুরু করেছে। আপামর ভারতবর্ষের নাগরিক সমাজের শুভবুদ্ধির উদয় অচিরেই সমগ্র ভারতবর্ষকে 'ওয়ান নেশন ওয়ান ল'-এর এক সুতোয় গাঁথবে। ভারতীয় জনজাতি সমাজ সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের অন্তর্গত হওয়ার দরুন তাদের নিজস্ব সামাজিক আইনের সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার তাদের সংশ্লিষ্ট সমাজে বলবৎ থাকবে। কিন্তু এই ইন্ডিয়ান সিভিল কোড প্রণীত হলে সম্পূর্ণ ভারতীয় সমাজ, সব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান সামাজিক ও আইনি ন্যায়বিচার লাভ করবে। শাহবানো মামলার রায় উলটে দেওয়ার মত ঘটনায় নারী সমাজের প্রতি তীব্র অসাম্য-অবিচার, পার্সোনাল আইনের অন্তরালে ব্যাপক নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক তোষণ এবং চূড়ান্ত ভেদাভেদের যুগ পেরিয়ে স্বাধীনতা লাভের অমৃতকালে ভারতবর্ষ অচিরেই এই ইউনিফর্ম সিভিল কোডের আইনি অধিকার অর্জন করবে, এই ভারতীয় দেওয়ানি বিধি সমাজের সব স্তরে ন্যায় ও সাম্যের সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে, জাতির চরিত্র গঠন করবে— এটা ভারতীয় নাগরিক সমাজের প্রার্থনা। স্বাধীন, সার্বভৌম দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষিত হয়ে বিবিধের মাঝে মহান ঐক্য অর্জিত হওয়া এবং একাধিক আইনের জটিলতার অবসান হয়ে সব সামাজিক দূরাচার দূর হওয়া, নারীদের প্রতি সব অসাম্য দূর হয়ে পলিগ্যামী, নিকাহ্ হালালার মতো সব সামাজিক ব্যধি নির্মূল হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। □

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম, কংগ্রেসের দিদি-মোদী সেটিং তত্ত্ব বুমেরাং হয়ে ফিরেছে

আনন্দ মোহন দাস

গত ২৩ জুন পাটনায় ১৫টি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের বাঁচার তাগিদে এক সম্মেলন হয়ে গেল। দুই-একটি দল বাদে সবকটি দলই হলো পারিবারিক দল এবং সকলেই দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে ইডি, সিবিআইয়ের তদন্তাধীন। এরা মোদীকে গদিচ্যুত করে তদন্ত বন্ধ করতে চায় এবং দেশকে লুটেপুটে খাবার পাকা ব্যবস্থা চায়। এই নেতারা বুঝেছে মোদী থাকলে তা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। তৃণমূল নেত্রী প্রচারে বলছেন মোদী জিতলে নাকি এটাই হবে শেষ নির্বাচন যা তিনি স্বাভাবিকভাবে প্রতি নির্বাচনে বলে থাকেন। এরা এক অদ্ভুত মোদী বা বিজেপি আতঙ্কে ভুগছে। প্রত্যেকের একমাত্র অ্যাজেন্ডা হলো মোদী হঠাও। নীতি ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের পরস্পরবিরোধী দলগুলি একত্র এসে মোদী সরকারকে হঠাতে চাইছেন। তাদের রাজ্যে রাজ্যে কুস্তি আর পাটনায় দোস্তি। রাজনৈতিক দলগুলোর এই দ্বিচারিতা দেশের মানুষ ভালোভাবে নেবেন না বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী বন্ধুরা কিছুদিন যাবৎ রাস্তাঘাটে, মিডিয়ায় সর্বত্র জনগণের কাছে পরিকল্পিত ভাবে মোদী-দিদি সেটিঙের তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূলের আসল সেটিং তো পাটনায় দেখা গেল। সুতরাং সিপিএম, কংগ্রেসের সামনে এখন একটাই প্রশ্ন উঠবে সিপিএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস কি গোপনে একই ছাতার তলায় রাজনীতি করছে? পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের চীৎকার আর পাটনায় একই টেবিলে বসে ভুরিভোজ। হিংসায় আক্রান্ত নীচুতলার কর্মীদের কী তারা বোঝাবেন? তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এদের তার জবাব অবশ্যই দিতে হবে। দিদি ভাই-মোদীভাই নকল সেটিং তত্ত্ব খাড়া করে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে প্রকৃত সেটিং এরাই করে চলেছে তা আজ সকলের কাছে পরিষ্কার। সিপিএম বরাবরই ঘোলা জলে মাছ ধরতে ভালোবাসে।

কতকগুলো বিপরীত মেরুর দলের অশুভ আঁতাতকে জোট না বলে ঘোঁট বলাই ভালো। বিজেপির বিরুদ্ধে এই ধরনের জোট বা ঘোঁট করার প্রয়াস ২০১৯ সালেও মমতা ব্যানার্জির আহ্বানে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সবাই হাত মিলিয়েছিলেন এবং একসঙ্গে লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মঞ্চ ছেড়েছিলেন। তাদের প্রকৃত স্বরূপ গত লোকসভা নির্বাচনে সকলের সামনে প্রকাশ হয়েছিল। বরং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ-র মধ্যে বিজেপি একটাই তিনশোর বেশি আসনে জয়লাভ করে সরকার গড়েছিল। কেবলমাত্র ক্ষমতা ও নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ভিন্ন আদর্শের দল একত্রিত হলেই কোনো জোট হয় না তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এর মূল কারণ হলো— (১) আদর্শহীন পরিবার ভিত্তিক দলগুলো মূলত রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দল হিসেবে কিছু ক্ষমতা থাকলেও কেউই নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্য দলকে আসন ছাড়তে চায় না। (২) অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে আগে থাকতে চায়। (৩) প্রত্যেকে নিজের দলের অ্যাজেন্ডা চালাতে চায়।

বর্তমানে কংগ্রেস-সহ কোনো দলই নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিশমা ও বিজেপির সংগঠনের সঙ্গে সর্বভারতীয় স্তরে এককভাবে লড়াই করার জায়গায় নেই। সেজন্য কংগ্রেসও জোটে যাওয়ার চেষ্টায় রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য, সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেস দলের কিছু রাজ্যে অবশ্যই শক্তি রয়েছে এবং কয়েকটি রাজ্যে তারা ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু মোদীর বিরুদ্ধে এককভাবে লড়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্ব তাদের নেই। তারাও স্বাভাবিকভাবে নিজেদের শক্তিশালী জায়গায় অন্যদের থাবা বসাতে দেবে না, কারণ তারা বেশি আসন জিতে প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে থাকতে চায়। সুতরাং এই দলগুলো নীচু স্তরে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে আগ্রহী নয়। এখানেই মূল বিরোধ এবং আসন সমঝোতা না হয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তাছাড়া বিরোধী জোটে বেশিরভাগ দলের নেতা-নেত্রীরা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলি বিচারাধীন রয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগে সিবিআই, ইডি-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের সম্মুখীন। সেজন্য দুর্নীতিবাজরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হটাতে

না পারলে নিজেদের সমূহ বিপদ বলে আতঙ্কে ভুগছে। এটাই তাদের মোদী হঠাও অভিযানের মূলমন্ত্র।

মোদী ঠিকই বলেছেন, সমস্ত দুর্নীতিবাজ পাটনায় একত্রিত হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেছেন দেশে শিক্ষায় টিএমসি এবং ডিএমকে রেশনে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি করেছে। মহারাষ্ট্রের এনসিপির ৭০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই সব দলের নেতারা এক হবেন এটাই স্বাভাবিক। পাটনায় এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বেশিরভাগই পারিবারিক দল। যেমন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী, টিএমসির মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জি, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, এনসিপির শারদ পাওয়ার ও সুপ্রিয়া সুলে, ঝাড়খণ্ড পার্টির শিবু সোরেন-পুত্র হেমন্ত সোরেন, ডিএমকের করুণানিধি-পুত্র স্ট্যালিন, আরজেডির লালু যাদব ও তেজস্বী যাদব, শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে ও আদিত্য ঠাকরে, এনসির ফারুক পুত্র ওমর আবদুল্লা, পিডিপির মুফতি মহম্মদ সঈদের কন্যা মেহবুবা মুফতি ইত্যাদি। পারিবারিক দলগুলো দেশের স্বার্থের চেয়ে পরিবারের স্বার্থ সর্বাগ্রে রাখে। বিজেপি বিরোধী দলের নেতারা বিলক্ষণ জানেন পারিবারিক সুবিধা মোদীর আমলে নৈব নৈব চ। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ মোদী নাকি স্বৈরতন্ত্রী, গণতন্ত্র ও সংবিধান মানেন না।

কিন্তু আমরা যদি জোটপন্থী বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির শাসন লক্ষ্য করি, দেখা যায় তাঁরাই বেশি স্বৈরতন্ত্রী, অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান বিরোধী কাজ করে চলেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল একদলীয় শাসন চায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা বিরোধী মুক্ত পঞ্চায়েত চায়। সেজন্য সর্বত্র হিংসা, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এরা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চালাচ্ছে। প্রত্যেক নির্বাচনে হিংসায় বহু মানুষের প্রাণ যায়। এই রাজ্যে নির্বাচন মানে সন্ত্রাস ও হিংসা। এদের মদতে আদালতে বিচারকের দরজার সামনে অবরোধ করা হয়। অভিযোগ, অপ্রিয় রায় এলেই বিভিন্ন ভাবে বিচারককে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বিচারকদের বাড়ির দেওয়ালে রাতের অন্ধকারে পোস্টার লাগিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। ভারতের কোনো রাজ্যে এই ধরনের অবস্থা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এদের মুখে সংবিধান, গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, আদালতের কথা মানায় না।

সরকারের বিরুদ্ধে টুইটারে কিছু লিখলে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার বিজেপির সাধারণ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে মানুষে ওপর অত্যাচার চালায়। সুতরাং এদের মুখে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বুলি খাপ খায় না। পঞ্জাবে আপ পার্টির শাসনকালেও বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হয়। সুতরাং এদের মুখে এই ধরনের কথা শোভা পায় না। কেরলে সিপিএমও কংগ্রেস সভাপতিকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয় অথচ তাদের নেতা পাটনায় একসঙ্গে বসে ভুরিভোজে অংশগ্রহণ করে।

বিরোধী জোটে বেশিরভাগ দলের নেতা-নেত্রী দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাগুলি বিচারাধীন। বিভিন্ন অভিযোগে সিবিআই, ইডি-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের সম্মুখীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীতীশ কুমার জীবনের শেষলগ্নে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে দেশের বিজেপি বিরোধী নেতাদের একত্র করার নিষ্ফল প্রয়াস করে চলেছেন। তাঁর নিজের দলের সার্বিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আরজেডির সঙ্গে আঁতাতের বিরুদ্ধে অনেক নেতা দল ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। তাঁর দুই জোট সঙ্গী জিতেন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়ামি মোর্চা এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি নীতীশের সঙ্গ ছেড়ে এনডিএ-র দরজায়। তাঁর দল জেডিইউ-এর সাংগঠনিক অবস্থাও খুব একটা সুখকর নয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যে কোনো সময়ে আরজেডির নেতা তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে নতুবা অপমানিত হয়ে পদত্যাগ করতে হবে।

এতো ঘটা করে আয়োজিত পাটনার বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা সামনে অসেনি। জোটের নেতা কে হবেন ঠিক হয়নি। জোটের ন্যূনতম কর্মসূচি স্থির হয়নি। রাজ্যে রাজ্যে আসনরফার কোনো ফর্মুলা নির্ধারিত হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে কেবলমাত্র রাহুল গান্ধীর বিবাহের জন্য লালুর সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং সকলেই যে বরযাত্রী যেতে চান তা সামনে এসেছে। জানা গেছে, এই বৈঠকের মধ্যেই কেজরিওয়াল ও রাহুল গান্ধীর মধ্যে দিল্লি সরকারের আমলা বদলি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অধ্যাদেশ জারির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সমর্থন পাওয়া নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেজরিওয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে না থেকে সঙ্গীদের নিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট থেকে দিল্লি রওনা দিলেন। আপ আগামীদিনে কোনো জোটে থাকবে না বলে কেজরিওয়াল হুশিয়ারি দিয়েছেন। প্রথম বৈঠকেই বিরোধী জোটে মতানৈক্যের সূচনা দেখা গেল।

প্রকৃতপক্ষে যখন রাজ্যে রাজ্যে আসনরফার বিষয়টি আসবে তখনই জোটের মধ্যে বিদ্রোহ আরও বেশি করে দেখা দেবে বলে অনেকে মনে করছেন। ইতিমধ্যে অখিলেশের সঙ্গী উত্তরপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় লোকদলের নেতা জয়ন্ত চৌধুরী অসুস্থতার কথা বলে বৈঠক থেকে দূরে থেকেছেন। বহুজন সমাজ পার্টি, অকালি দল, বিআরএস, টিডিপি, বিজেডি,ওয়াইএসআর কংগ্রেস -সহ অনেক আঞ্চলিক দল বিরোধী জোটের বাইরে রয়েছে। সুতরাং ওই জোট কতটা সফল হবে তা সন্দেহ রয়েছে। মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যে এনসিপি দল ভেঙে গেছে। অজিত পাওয়ার রাজ্যের এনডিএ মন্ত্রীসভায় ৮ বিধায়ক-সহ যোগদান করেছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচন এখনও দশ মাস বাকি, তার আগে অনেক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে পাটনায় এই সম্মেলনে টিএমসি, সিপিএম ও কংগ্রেস একসঙ্গে মিলিত হওয়ায়, পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম, কংগ্রেসের মোদীভাই দিদিভাই-সেটিং তত্ত্ব সর্বৈব মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়ে গেছে। বরং নিজেরাই সেই জালে জড়িয়ে গেছে। ▯

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভুলের দায়

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রাষ্ট্রনীতি যে বহুক্ষেত্রে ভুল ছিল এবং সেসব ভুলের মাশুল যে আজও আমাদের গুনতে হচ্ছে, তা অনস্বীকার্য। তবে, সেসব ভুলের দায় মহাত্মা গান্ধীর উপরও বর্তায়। কারণ, জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন গান্ধীজীর আগাম আনুকূল্যে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে পনেরোটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মধ্যে বারোটি কমিটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে কংগ্রেস সভাপতি পদে চেয়েছিল; জওহরলালকে চেয়েছিল মাত্র তিনটি প্রদেশ কমিটি। স্বভাবতই, সে বছর সর্দার প্যাটেলের কংগ্রেস সভাপতি হবার কথা ছিল। কিন্তু গান্ধীজী জওহরলালকে কংগ্রেস সভাপতি পদে চাইছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ব্রিটিশদের ভাবধারার সঙ্গে জওহরলালের অধিক সাযুজ্য। আসন্ন ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যায়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার কাজে জওহরলাল অধিক যোগ্য ব্যক্তি '...transfer of power was imminent and he (Gandhi) thought that Nehru would be able to get along better with the British—with whom he had greater affinity of thought and culture than any other congress leader...।' —('the Indomitable Sardar'—K.L. Panjali; p. 166)। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কংগ্রেসি না থেকেও তিনি ছিলেন কংগ্রেসের শেষ কথা। ড. পট্টভি সীতারামাইয়া বলেছেন— 'Gandhi, though not a member of the Congress, was still the power behind the throne'— ('History of the Indian National Congress'-p. 72)। জওহরলালের কথায়, গান্ধী ছিলেন— 'permanent super President of the Congress and the Congress at present meant Gandhiji' ('Nehru on Gandi' p. 78)। শেষ পর্যন্ত, সভাপতি পদের নির্বাচন থেকে সর্দার প্যাটেলকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল, ('...Gandhiji persueded Sarder and kripalani to withdraw their candidatures', — K.L. Panjabi')। ফলে, গান্ধীর স্নেহধন্য জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গিয়েছিলেন।

কে.এল. পাঞ্জাবি মন্তব্য করেছেন— 'Pandit Nehru owed his appointment as Prime Minister to his election as President of the Congress in 1946। কথাটি ভুল নয়। সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের ভুলের দায় থেকে গান্ধীজীকে রেহাই দেওয়া যায় না।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

অপরিণামদর্শী আত্মঘাতী হিন্দু

বর্তমানে হিন্দুদের মতো নির্বোধ, আত্মঘাতী, অপরিণামদর্শী মনুষ্য সমাজে আরও আছে কি না আমার জানা নেই। পাঁচশো বছর বিদেশি বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত, নিপীড়িত এবং ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েও যারা শত্রু-মিত্র ভেদ করতে অপারগ তাদের অবলুপ্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। হিন্দুদের বিশ্বাস হরি সংকীর্তন, মন্ত্রোচ্চারণ, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, পূজা আর্চা, যাগযজ্ঞ করলেই দেবতারা সন্তুষ্ট থাকেন আর দেবতারা সন্তুষ্ট থাকলেই সবরকম বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই হিন্দুরা নিজেদের সংগঠিত, সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিশালী করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে শুধুমাত্র বেদপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ধর্মচর্চা করে গেছে। ফলশ্রুতি সাতশো বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল, অত্যাচার, অনাচার। এত কিছু সত্ত্বেও হিন্দুরা স্থির করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তারা কোনও শিক্ষাই নেবে না। কাজেই এদের অবলুপ্তি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, অতীতের মায়া সভ্যতা, ইনকা সভ্যতা, অ্যাজটেক সভ্যতা বা মিশরীয় সভ্যতার মতো। হ্যাঁ, শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,চন্দননগর।

বিরোধী ঐক্যের সাতকাহন
কংগ্রেস বিরোধীরাও চাইছে কংগ্রেস মুক্ত ভারত

পাটনায় বিরোধী ঐক্যের সুর, তাল, লয় কেটেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হইচইয়ে। এর কারণ দেশবাসী বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জেনে গেছে। কংগ্রেসমুক্ত ভারতের কথা শুধু বিজেপি বলে না, পরোক্ষভাবে সেই বার্তা উঠে এসেছে মমতার বার্তায়। কেন বলছি? এর কারণ একটা ফর্মূলা তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি বললেন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হলে ১ : ১ প্রার্থী দিতে হবে। কীরকম সেটা? সেটা হলো যেমন এই রাজ্যে তৃণমূল শক্তিশালী, তাই এখানে শরিক দল কেউ প্রার্থী দেবে না। অর্থাৎ এই রাজ্যে কংগ্রেসের কেবলমাত্র সাইনবোর্ড থাকবে। আবার ফর্মূলা মেনে বামেরাও প্রার্থী না দিলে তাদের দশাও একই হবে। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি মারা। রাজ্য বিরোধীশূন্য হলো আবার দল বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ হলো (যদি ধরে নেওয়া যায় এ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির একটি আসনও জুটল না)। আবার তৃণমূলের উপস্থিতি অন্য রাজ্যে না থাকায় শরিকদের কাউকে আসনের অংশীদারিত্বও দিতে হবে না। এই প্রস্তাবে বাহবা বাহবা বলে তালি দিতে লাগলেন ওমর আর অখিলেশরা। কারণ বিজেপির মতো কংগ্রেসের উপস্থিতি কাশ্মীর বা উত্তরপ্রদেশে রয়েছে। কংগ্রেস এখন মরা হাতি বটে, দাম এখনো লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এঁরাও চাইছেন না নির্বাচনে কংগ্রেস থাকুক। একই অবস্থা মহারাষ্ট্রেও। পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরেও চাইছেন কংগ্রেস যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেয়। অর্থাৎ সংসারে বড়ো ভাইয়ের ভূমিকা থাকে আত্ম ত্যাগের, সেই ভূমিকা পালন কংগ্রেস করুক জোটের স্বার্থে।

বিরোধীরা পাটনায় তেইশ জুনের এই মিলনকে ঐতিহাসিক

ফঃ ৩

বলছে। তাদের মতে ভারতীয় রাজনীতির সাতরঙা দলগুলো জয়প্রকাশ নামক প্রিজমের ওপর পড়ে এক রঙের দল তৈরি হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর তানাশাহির বিরুদ্ধে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের রাজনীতি আর আজকের রাজনীতি এক নয়। এর মুখ্য কারণ হলো জয়প্রকাশ এবং মমতা-নীতীশরা এক নন। জয়প্রকাশ নিঃস্বার্থভাবে এক স্বৈরতান্ত্রিক অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তিনি ছিলেন কিংমেকার; কিং হবার বাসনা তাঁর ছিল না।কিন্তু তথাকথিত এই বিরোধী জোটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিজ স্বার্থ নিজ নিজ রাজ্যে চরিতার্থ করা। তেমন আপের জোট নৈকট্যের মূল কারণ হলো দিল্লির আমলা অপসারণ বিলের অর্ডিন্যানসের বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের বিরোধিতা করে ভোট দেওয়া। আবার এ রাজ্যে কংগ্রেস ও সিপিএমকে সাইনবোর্ডে রূপান্তর করার চক্রান্তে ২০২৪ সালে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১ : ১ ফরমূলার প্রস্তাব।

এতসব জটিল অঙ্ক সমাধান করতে জুলাইয়ের পরীক্ষায় ব্যাঙ্গালোরে মিলত কিনা বিরোধীরা, এটাই বড়ো প্রশ্ন। এদিকে মারাঠা নেতা আগাম গেয়ে রেখেছেন জোট তো হলো মুখ কে বিজেপির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে? রাহুল বা নীতীশের মধ্যে যে কাউকে শরদ পাওয়ারের দল মানবে না এটা স্পষ্ট। এদিকে বিরোধী জোটের জন্য বড়োবেশি তাগিদ তৃণমূলের। কারণ কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ও আদালত যেভাবে দলীয় নেতা-নেত্রীদের দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তাতে যতশীঘ্র সম্ভব বিজেপিকে হারিয়ে কেন্দ্রে জোট সরকার গড়তে পারলে তদন্ত শেষ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো বিরোধী দলের যারা শামিল হয়েছিলেন পাটনায়, তাঁদের সবাই দুর্নীতিপরায়ণ এবং সেই সম্পর্কে এরা সবাই তুতো ভাই। এ রাজ্যে সিপিএম ও কংগ্রেস তুতো ভাই হলেও কেরালায় দুই দল সম্পর্কে 'জানি দুশমন'। কেরালায় কংগ্রেস নেতা সুধাকরণকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করেছে কেরালা পুলিশ। এ নিয়ে সরব রাহুল গান্ধী স্বয়ং। সিপিএমের সাফাই, এটা পুলিশের কাজ, সরকারের কিছু নাকি করার নেই। সরকারের ইশারা নেই অথচ সুধাকরণকে পুলিশ ধরল— এমনটা দুধের শিশুও বুঝতে চাইবে না। আবার ১ : ১ ফর্মূলা জোটের খাতিরে এ রাজ্যে যদি কংগ্রেস মেনে নেয়, ২০২৪-এর নির্বাচনে তাহলে নির্ঘাত কুণালের চাকরি যাবে মুখ্য মুখপাত্রের পদ থেকে এবং কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে অধীরকে ওই পদে বসাবেন নেত্রী। কৌস্তভ বাগচী আর ন্যাড়া হবেন না, একবারই বেলতলায় গেছেন নেত্রীকে হারাবার শপথ নিয়ে। যাইহোক, এত 'কিন্তু', 'যদি' নিয়ে তৈরি বিরোধীদের ২৩ জুনের পাটনার জোট ব্যাঙ্গালোরে ঠাণ্ডাতে কতটা জমে সেটাই দেখবে এবার দেশবাসী।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

জ্যোতিষশাস্ত্র একটি বেদাঙ্গ : সর্বৈব সত্য

বৈদিকযুগে ঋগ্বেদের সময় আনুমানিক যিশুখ্রিস্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্তক আঠারোজন মহর্ষি হলেন— ব্রহ্মা, সূর্য, মনু, বশিষ্ঠ, অত্রি মরীচি, ভৃগু, পরাশর, ব্যাস, কশ্যপ, অঙ্গিরা, গর্গ, রোমন, পৌলিশ, চ্যবন, শৌনক, যবনাচার্য (যমুনাচার্য) ও দেবর্ষি নারদ। ব্রহ্মার মানসপুত্র আঠারো জন মহর্ষির মধ্যে ঋষি পরাশর (ঔর্ব) সংহিতায় কথিত আছে 'পূর্ব জন্মার্জিতং কর্মং শুভাশুভ ফলপ্রদম্/পুণ্যপাপ সমুদ্ভুতং গ্রহরূপেণ সংস্থিতম্'। অর্থাৎ পূর্বজন্মের পুণ্য ও পাপ বর্তমান জন্মে গ্রহরূপে রাশিচক্রে সংস্থিত হয়েছে। গ্রহগণ স্বাধীন নন। তাঁরা কর্মফলরূপী ঈশ্বর জীবাত্মা তথা আদ্যাশক্তির অধীন। মানুষকে তার ভবিষ্যতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য যাতে সে নিজের ভাগ্যের অবস্থা বুঝতে পারে এবং সঠিক পথে চলতে পারে। সেই জন্য ফলিত জ্যোতিষের সৃষ্টি।

জন্ম-মৃত্যু বাদ দিলে ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল শতকরা আশি ভাগ মেলে। এই ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়, বোঝা যায়। সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া যায়। অর্থাৎ নিজেকে জানবার, শোধরাবার ও প্রতিষ্ঠিত হবার একমাত্র উপায়। ইষ্টলাভ না হলে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্য উপলব্ধি হয় না। শ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন— 'যার নেই ইষ্ট, তার সবই অনিষ্ঠ, যোগ-জ্যোতিষ-বৈদ্য ইষ্ট বিনা ভ্রষ্ট'। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সব মানুষের ভবিষ্যৎ জানা প্রয়োজন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের আসল উদ্দেশ্য হলো পরাবিদ্যা, যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়ে থাকে। সেই মধুবিদ্যায় পৌঁছনো অর্থাৎ শ্রেয়লাভ করা। ফলিত জ্যোতিষ একটি বেদাঙ্গ। ষড়দর্শন ও বেদাঙ্গের উদ্দেশ্যই হলো শ্রেয়লাভের পথ প্রদর্শন করা। বেদের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্রেরই প্রাধান্য বেশি। কারণ, ফলিত জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। জ্যোতিষ বেদের চক্ষু স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের প্রকাশ। দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি গর্গ বলেছেন, জ্যোতিষের সাহায্য ব্যতীত মানব অন্ধবৎ, তার জীবন অন্ধকারময়। যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতির অধীন ততক্ষণ পর্যন্ত কালরূপী প্রকাশমান জ্যোতিষশাস্ত্রের অধীন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, অতীত জীবনের চিন্তা এবং কর্মরাশি ফল আমাদের এই জীবন।

মহাভারতে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলেছেন— 'মহেশ্বরের প্রতি যার অবিচলিত ভক্তি, গ্রহগণ কখনও তাকে আক্রমণ করতে পারে না' (দ্রঃ বনপর্ব ২২৯)। মহর্ষি বেদব্যাস, যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'দৈবকৃপা সময় না হলে হয় না। দৈবের চেয়ে মহাবল আর কিছুই নেই।' মানুষের স্বভাব প্রকৃতির পরিবর্তনই হচ্ছে দৈবকৃপা। যোগ-জ্যোতিষ-তন্ত্র-চিকিৎসা প্রত্যক্ষ শাস্ত্র; অন্যান্য বিনোদন শাস্ত্র মাত্র (দ্রঃ কুলার্ণব তন্ত্র ২/৯০) জ্যোতিষশাস্ত্র সর্বৈব সত্য। ভাগ্যেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি, যত্নেন কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ। অর্থাৎ ভাগ্যের দ্বারা ফললাভ হয় ইহা কাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন। তবে যত্নের ও চেষ্টার দ্বারা যদি ফল লাভ না হয় তাহা হইলে কাহারও দোষ নাই অর্থাৎ ভাগ্যই মানিতে হইবে।

—**অচিন্ত্যরতন দেবীতীর্থ,**
দেউলটি, হাওড়া।

অন্নের অপচয় বন্ধ করতে পারেন মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

খাবার নষ্ট করা উচিত নয়— ছোটোবেলা থেকেই একথা আমরা শুনে আসছি। অথচ তা সত্ত্বেও আমরা প্রায়ই খাবার ফেলে দিই বা নষ্ট করে থাকি। খাবারের প্রতি আমাদের এই ধরনের মানসিকতার জন্য আজ খাদ্যসংকট সমগ্র বিশ্বে একটি ঘোরতর সমস্যার রূপ নিয়েছে। আমরা মা-লক্ষ্মীর হাতে ধান দেখি, মা-অন্নপূর্ণাকে দেখি অন্ন বিলোতে— এই ভাবে প্রাচীনকাল থেকেই অন্নকে ভগবানের দেওয়া প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। খাবারকে প্রণাম করে তারপর তা গ্রহণ করার মতো ভালো প্রথা এই যুগেও অনেকে মেনে চলেন। এই সংস্কারের জন্য তাঁরা ভগবানের প্রত্যক্ষ দান খাবার নষ্ট করেন না। তাই খাদ্যান্নের বিন্দুমাত্র অপচয় হয় না। কিন্তু, যখন আমরা পাশ্চাত্য ভোগবাদী মানসিকতায় বশীভূত হয়ে খাবার খাই, তখন এই ভাব থাকে না। অনেক সম্পন্ন ঘরে খাবার অপচয় করা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খাবার নষ্ট করা মানেই আর্থিক ও পরিবেশ উভয়েরই যে ক্ষতিসাধন হয়— তা বিশেষজ্ঞরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে চলেছেন। প্রতি বছর আমরা ৬.৭ কোটি খাদ্যান্ন নষ্ট করে থাকি। এই পরিমাণ খাবার ব্রিটেন সারা বছরে উৎপাদন করতে পারে না এবং তা দিয়ে বিহারের মতো বড়ো রাজ্যের সারা বছরের খাদ্যান্নের প্রয়োজন মিটতে পারে। অপচয় করা ওই পরিমাণ খাবারের দাম ৯২ হাজার কোটি টাকা। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মন কি বাত'-এ অন্নের অপব্যবহার না করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের দেশের অনেক গরিব মানুষের দু'বেলার খাবার জোটে না। তা সত্ত্বেও বাড়ি, বিয়ে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণ খাবার আমরা নষ্ট করে থাকি। যেসব খাবার নষ্ট করি, সেগুলি তৈরি করতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়। ১ কিলোগ্রাম গম নষ্ট হওয়ার মানে ১৫০০ লিটার জল নষ্ট হওয়া, ১ কিলোগ্রাম চাল নষ্ট হওয়া মানে ৩৫০০ লিটার জল নষ্ট করা। এছাড়া খাবার তৈরির জন্য কৃষিযোগ্য জমি, গ্রিনহাউস গ্যাসের সৃষ্টি, প্রচুর মাত্রায় তেল কৃষিযোগ্য মেশিন চালাতে ব্যয় হয়। একদিকে বিপুল জনসংখ্যার চাপ, অপরদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমি। সেজন্য বর্তমান বা ভবিষ্যতে খাবারের অপচয় বন্ধ করতে পারলে খাদ্যসমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব। ছোটো কৃষকদের সুবিধার জন্য গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট কোল্ড স্টোরেজ এবং গ্রামগুলির আশেপাশে মেগা ফুডপার্ক তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় যেসব জিনিস তাড়াতাড়ি খারাপ হয় যেমন ফল, সবজি সময়মতো প্যাকেজিঙের সুবিধা হবে। অপুষ্টির শিকার প্রায় ২০ কোটি ভারতীয়র পেট ভরে খাওয়ানোর জন্য সামাজিক সংস্থাগুলিকে ফুডব্যাংকের সাহায্য নিতে হবে। অনেক সামাজিক সংস্থা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে রোটি ব্যাংক, রবিনহুড আর্মি, পৃথ্বী ইনোভেশন, নো ফুড ওয়েস্ট, ফিডিং ইন্ডিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অন্নের অপচয় বন্ধ করায় মহিলাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যতটা প্রয়োজন, ততটাই যদি কেনাকাটা করি, তাহলে খাবার ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হয়। ফ্রিজে অনেকসময় একদিন আগের রান্না করা খাবার রাখা থাকে, পরের দিন খাবার পরিবেশনের সময় সেই পুরনো খাবার সবার আগে খেয়ে নেওয়া ভালো। বেশি সবজি কেনা হলে, সেগুলি ভালোভাবে গুছিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে নষ্ট হবে না, সময়মতো বের করে রান্না করে খাওয়া যাবে। অনেক সময় একটু একটু বেঁচে যাওয়া খাবার একসঙ্গে মিশিয়ে গরম করে নতুন স্বাদের একটা তরকারি তৈরি হয়ে যায়। মরশুমি ফল, সবজি খাওয়া ভালো এবং সেগুলি চট করে খারাপও হয় না। অনেকে আছেন যাঁরা সবজির সব অংশ দিয়েই সুস্বাদু রান্না করতে জানেন। যেমন খোসার চচ্চড়ি, ডাটাচচ্চড়ি, খোসা ভাজা ইত্যাদি। নানা সবজির সঙ্গে শাক (কপি, মুলো, বিট) ইত্যাদি দিয়ে রকমারি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবারও তাঁরা বানিয়ে থাকেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় কিছু খাবার নষ্ট করার পরিবর্তে সেগুলি কুকুর, পাখির খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা শ্রেয়। এছাড়া বেঁচে যাওয়া কিছু তরকারি, খোসা ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে দিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়, যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক। এইভাবে মহিলারাই খাবার নষ্ট না করার নানারকম উপায় দেখতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী একটি উপদেশ আমাদের সবার জন্য গ্রহণযোগ্য, তা হলো, খাবার সময় পেট ও প্লেট দু'টিই একটু খালি রাখুন। মায়েরাই পারেন ছোটদের ছোটবেলা থেকে এর অভ্যাস করাতে। □

আয়রনের অভাব যেভাবে টের পাবেন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

লৌহ বা আয়রন আমাদের শরীরের অন্যতম অতি প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান। রক্তের লোহিত কণিকা তৈরির কাঁচামাল। এর অভাবে লোহিত কণিকা তৈরি হতে পারে না। তাই রক্তশূন্যতার অন্যতম প্রধান কারণ আয়রনের ঘাটতি। কিন্তু আয়রন শুধু রক্তকণিকা তৈরি করে না, দেহের শক্তি উৎপাদন থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের স্নায়ুপ্রবাহও নির্ভর করে পর্যাপ্ত আয়রনের উপস্থিতির ওপর। তাই দেহে আয়রনের ঘাটতি হলে দেখা দিতে পারে বহুবিধ সমস্যা। রক্তশূন্যতা আয়রন ঘাটতির সর্বশেষ স্তর। জেনে নিন, আয়রন ঘাটতি হলে আবার কী কী উপসর্গ দেখা দিতে পারে—

১. শারীরিক দুর্বলতা। ২. মাথাব্যথা বা মাথা ঘোরানো। ৩. মনোযোগ কমে যাওয়া। ৪. স্মরণশক্তি ঘাটতি। ৫. মাংসপেশিতে ব্যথা। ৬. অস্থিসন্ধিতে ব্যথা। ৭. চুল পড়ে যাওয়া। ৮. বুক ধড়ফড় করা বা বুক ভার হয়ে থাকা। ৯. শ্বাসকষ্ট। ১০. স্থূলতা। ১১. রেস্টলেস্ লেগস্ সিনড্রোম অর্থাৎ পা-হাতে শিরশির অনুভূতি হওয়া, পা চিবানো, পায়ে নিস্তেজ ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এ ছাড়া আয়রনের অভাবজনিত কারণে গলার মধ্যে কিছু আটকে থাকা, নখ বেঁকে যাওয়া, খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া, খাদ্য নয় এমন খাবারে আসক্তি ইত্যাদিও হতে পারে।

কেন হয় ঘাটতি : আয়রন ঘাটতি হলে অবশ্যই এর কারণসমূহ জানতে হবে। যেমন— খাবারে আয়রন ঘাটতি হচ্ছে কিনা, বিশেষ করে যাঁরা নিরামিষভোজী। শরীরে আয়রনের চাহিদা বাড়লে যেমন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বা দুগ্ধ দানকারী মাকে বাড়তি সাপ্লিমেন্ট খেতে হতে পারে। পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ যেমন সিলিয়াক ডিজিজ, ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ বা আইবিডি, দীর্ঘদিন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়া, পাকস্থলির সার্জারির পর, দীর্ঘদিন পরিপাকনালি থেকে রক্ত নির্গমন (যেমন অর্শ বা পাইলস), কৃমি সংক্রমণে, দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধ সেবন এবং রক্ত পাতলা করার ওষুধ খেলেও হতে পারে আয়রন ঘাটতি।

প্রতিরোধ : আয়রনের ঘাটতি আমরা খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারি। আয়রন রয়েছে এমন খাবার যেমন কলিজা, মাছ, হাঁস-মুরগির মাংস, সবুজ শাকসবজি বিশেষ করে পালংশাক, কুমড়োর বীজ, ব্রকলি, ড্রাই ফ্রুট (যেমন কিশমিশ), অ্যাপ্রিকট, বাদাম, ডালিম, কলা, আপেল ইত্যাদি খাবার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। মানবদেহে আয়রন পরিশোষণের জন্য ভিটামিন সি অপরিহার্য। তাই খাদ্যতালিকায় আয়রনযুক্ত খাবারের পাশাপাশি ভিটামিন সি যুক্ত খাবারও রাখতে হবে। বাড়ন্ত বয়সে আয়রনের চাহিদা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে, তাই বাড়ন্ত বয়সে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার বেশি রাখতে হবে। নিয়মিত বছরে ১২ বার কৃমিনাশক ওষুধ নিতে হবে। কৃমি যাতে না হয় এ জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি (যেমন বাথরুম করার পর সাবান দিয়ে হাত ভালোভাবে ধোয়া, খালি পায়ে না থাকা ইত্যাদি) মেনে চলতে হবে। দীর্ঘদিন গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ এবং আয়রন সাপ্লিমেন্ট একসঙ্গে খাওয়া যাবে না। ন্যূনতম ১ থেকে ২ ঘণ্টার বিরতি রাখতে হবে। পাইলসজনিত রোগ থেকে বাঁচতে বেশি করে জল, শাকসবজি খেতে হবে যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ডাক্তার দেখিয়ে আয়রন ঘাটতিজনিত রোগ নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করানো।

প্রতিকার : শরীরে আয়রনের ঘাটতি দেখা দিলে শুধু আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেলে হবে না, আয়রন সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে। আয়রন সাপ্লিমেন্ট দু'ভাবে দেওয়া যায়। ১. আয়রন ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের মাধ্যমে। ২. শিরা পথে আয়রন ইনজেকশন। সাধারণত আয়রন ঘাটতি হলে মুখে খাবার ওষুধ দিয়ে পূরণ করা যায়। কিন্তু এই কারণগুলোর কোনোটা থাকলে শিরাপথে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করতে হবে আয়রন ওষুধ দ্বারা— পেটে প্রদাহ হলে, আয়রন হজমজনিত কোনো রোগে আক্রান্ত হলে, শরীর থেকে রক্তপাত, সর্বোপরি শরীরে আয়রনের প্রচুর ঘাটতির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলে। রক্তশূন্যতা ছাড়া দেহে আয়রন ঘাটতিতে রক্ত দেওয়ার কোনো নির্দেশনা নেই। বরং তা দেহের জন্য ক্ষতিকর। আয়রন ঘাটতির সঠিক কারণ বের করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। ◘

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ঐক্যসাধনার ব্রতে দীপ্তিমান

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

দেশকে কে টেনে নিয়ে যাবে? রবিঠাকুরের ভাষাই শুধু কি পলিটিক্যাল বাহন? যদি তাই-ই হয় তখন ' তার ঝড়ঝড় খড়খড় শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, ... পথ চললে চলতে দশবার করে যে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়িদড়া দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়... যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, তা বিরুদ্ধতায় ভরা...।' এক দেশের মানুষ তাদের পদবির ভিত্তিতে আইনকে নিজস্ব নিয়মে অভ্যাস করলে তার সামাজিক সুরক্ষার দশা ঠিক ওই গাড়িটার মতো হয়। পলিটিক্যাল গাড়িতে সব বিষয়কে চাপালে তার সমাধান তো হবেই না রবং দ্বন্দ্ব আরও বাড়বে।

এক দেশ এক আইন— কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়। বহুত্ববাদী ভারতে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সুরক্ষাকবচ হবে এই আইনি সংস্কার।

এক দেশ অনেক ভাষা, অনেক ধর্ম, অগনিত সংস্কৃতি কৃষ্টি । তা সেই দেশের সম্পদ ঐতিহ্য ঐশ্বর্য। তাকে আইনিভাবে রক্ষার অধিকার দেয় সেই দেশের সংবিধান। যদি সে দেশটা ভারতবর্ষ হয়, যার সংবিধান প্রতিটি ভারতবাসীর সমানাধিকারের পূজা করে। ন্যায্য সুশৃঙ্খল দেওয়ানি বিধির অনুশাসনে অভিন্ন আধুনিক সামাজিক পটভূমিতেই সম্ভব প্রগতিশীল, লিঙ্গবৈষম্যহীন সাম্যবোধে ঋদ্ধ ভারত এবং ভারতবাসীর নবোদয়। সেই নবোদয়ের তেজরশ্মির উৎস অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিয়ন সিভিল কোড ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে কি? যদি একটা দেশের বড়ো অংশের মুসলমান সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় সংবিধানের বাইরে দাঁড়িয়ে ইসলামিক হোমরুলে নারীর অধিকার, বিবাহ আইন, বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া, উত্তরাধিকার আইন পরিচালনা করে যা অংসখ্য লিঙ্গ অসমানতায় ভরা। বা যদি কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠী দেশের সংবিধানকে না মেনে তাদের প্রাচীন চিরাচরিত নিয়মে পরিবার ও সমাজ সংক্রান্ত আইনগুলি দিনের পর দিন অভ্যাস করে চলে, যে অভ্যাসে বঞ্চিত হচ্ছে এক শ্রেণী, সে অভ্যাসে পিছিয়ে থাকছে নারীরা। যে অভ্যাস উপস্থিত থাকার ফলে আসমুদ্রহিমাচলের ভারতবাসীকে সমআইনি সুরক্ষার আওতায় আনা যাচ্ছে না। তা যে সমাজ সংস্কারের পরিপন্থী। তাই এক দেশ এক আইন এককথায় need of the hour ! আসন্ন বাদল অধিবেশনেই ভারতের দেওয়ানি বিধিকে ভাষা ধর্ম নির্বিশেষে সব ভারতবাসীর জন্য প্রযোজ্য করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। যেখানে কোনো ধর্মের, গোষ্ঠীর, জাতির পার্সোনাল 'ল তার প্রাসঙ্গিকতা ও বৈধতা হারাবে। গত ১৪ জুন কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ২২তম আইন কমিশনের তরফে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর বিষয়ে ধর্মীয় সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভোপালের জনসভায় যে বক্তব্য রাখলেন তা কোনও পরিবারে যদি প্রত্যেক সদস্যের জন্য আলাদা আলাদা আইন থাকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির গুরুত্ব বোঝার জন্য

কারোর সংস্কৃতি এবং ধর্মে নাক গলাচ্ছে না এক দেশ এক আইন। এ কেবলমাত্রই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সর্বজনীন রূপ দেবে। যেন আইনি কক্ষে এসে, তা সে বিবাহ হোক কিংবা বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার হোক কিংবা দত্তক গ্রহণ— কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আইনে থেকে দেশের একটি মানুষও যেন অন্য আর একটি মানুষের সাপেক্ষে বঞ্চিত না হন।

> A uniform law, though is highly desirable, enactment thereof in one go perhaps may be counterproductive to unity and integrity of the nation
>
> SUPREME COURT IN PANNALAL BANSILAL PITTI ORDER

যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, 'তাহলে কি সেই সংসার চালানো যায়?' সমগ্র ভারত এক সংসার যাকে সুরক্ষা দিক কেবলমাত্রই সংবিধান। রোল উঠেছে। সরব লালুপ্রসাদ যাদবের মতো বোটব্যাংক রাজনীতিকরা। যিনি তির্যক ভঙ্গিমায় একে Dog whistle politics বললেন। কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ বা তাঁর মতো যারা তারা সবাই কোমর বেঁধে নেমেছেন এটাই প্রমাণ করতে, এক দেশ এক আইন আসলে ভারতের বহুমাত্রিক ধর্মসংস্কৃতির পরিপন্থী। বিষয়টিকে রাজনীতি এবং ভোটাভুটির ছকে ফেললে কোনোদিনই উত্তীর্ণ হবে না। সেই ছকে লালুপ্রসাদ বা জয়রাম রমেশরা সবসময়ই জিতবেন।

শাহবানু

বিষয়টি পুরোপুরি আইনি দৃষ্টিকোণে সাংবিধানিক বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি নারীর মতামতের ভিত্তিতে পর্যালোচনার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। প্রশ্ন উঠছে, ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৯ কি এতে অক্ষুণ্ণ থাকবে? যা প্রত্যেকটি ধর্মীয় সংগঠনকে অটোনোমি দিয়েছে এবং প্রতিটি সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত রাখার আশ্বাস রেখেছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৫-২৮ অনুচ্ছেদ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করছে। প্রশ্ন এখন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ওই সাংবিধানিক অনুচ্ছেদের কোনটির পরিপন্থী? কারোর সংস্কৃতি এবং ধর্মে নাক গলাচ্ছে না এক দেশ এক আইন। এ কেবলমাত্রই অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সর্বজনীন রূপ দেবে। যেন আইনি কক্ষে এসে, তা সে বিবাহ হোক কিংবা বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার হোক কিংবা দত্তক গ্রহণ— কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আইনে থেকে দেশের একটি মানুষও যেন অন্য আর একটি মানুষের সাপেক্ষে বঞ্চিত না হন।

অনুচ্ছেদ ২৫-এ বলা অধিকার কিন্তু জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতার প্রশ্নে মৌলিক অধিকার বলে ধরা নাও যেতে পারে, যেখানে ধর্মই একমাত্র মৌলিক অধিকার। এখন মতবিরোধ চলছে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রাখা হবে কী হবে না তা নিয়ে। আবার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪-এ উল্লেখ রয়েছে ভারতীয় সকল নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরির প্রচেষ্টা করবে ভারত।

বিষয়টা তো কেবল ধর্মীয় এমনও না। কারণ ভারতে বেশ কিছু অংশে পর্তুগিজ ও ফরাসি আইনের ঐতিহ্য এখনও জারি আছে। যদি উদাহরণ হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরকেই ধরি ২০১৯-এর ৫ আগস্ট পর্যন্ত স্থানীয় হিন্দু আইনের বিধি রাষ্ট্রীয় আইনের থেকে ভিন্ন ছিল। আবার কয়েক বছর আগে ওখানে ১৯৩৭-এর শরিয়া আইন বাতিল করা হয়। ফলে ওখানকার মুসলিম আইনের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের মুসলিম পার্সোনাল ল' পৃথক। গণপরিষদের মুসলমান সদস্যদের দৃষ্টিকোণ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। মহম্মদ ইসমাইল পর পর তিনবার ব্যর্থ হন অনুচ্ছেদ ৪৪ থেকে ইসলামিক নিজস্ব আইনকে বার করার ক্ষেত্রে। তিনি বলছেন ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মানুষের ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যুক্তি বলবে— ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলেই তো ধর্মের ভিত্তিতে আইনি বিচার মানুষ পাবেন না। পাবেন এক দেশ এক বিধানের ভিত্তিতে।

তবে আজ কেরালার মুসলমান মহিলারা কি মুসলমান নন? তাঁরা কি ধর্মাচারণ করছেন না? কিন্তু তাঁরাই গঠন করলেন Forum For Muslim Women Gender Justice (FMWGJ) যারা এই বছরের মার্চ মাসেও সংগঠিত প্রতিবাদী দাবি জানান। পথে পায়ে পা মিলিয়ে বলেন তারা ইসলামিক আইন থেকে অব্যাহতি চান। কিছুটা অব্যাহতি পেয়েছেন তাৎক্ষণিক তিন তলাককে অবৈধ ঘোষণার পর থেকে। কিন্তু কে দেবে ন্যায্য অধিকার উত্তরাধিকার আইনে? দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে!

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ফলে মুসলমান সমাজের বৃহদংশের উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তির মালিকানা অংশীদারিত্বে যে ঘোরালো ধাঁধালো জটিল শরিয়ত নিয়ম ছিল তার অবসান ঘটবে। প্রথমত জন্মগত সূত্রে অধিকার বিষয়টাই শরিয়ত আইনে বলা নেই। মৃত্যু পরবর্তী অধ্যায়েই পরিবারের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার অবকাশ আছে শরিয়ত আইনে। যেখানে একাধিক জটিলতা মারপ্যাঁচ। এবং যেহেতু বহুবিবাহ এতদিন পর্যন্ত আইনসিদ্ধ ছিল ফলে উত্তরাধিকারের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই জটিল। কিন্তু সে অধ্যায় আইনত ভাবে সমাপ্ত হচ্ছে এই বিধির ফলে। একদিকে বহুবিবাহ যেমন আইন বিরুদ্ধ হলো তেমনই উত্তরাধিকর বিষয়টাও সরল ফ্যামিলি ট্রি নির্ভর হবে। সম্পত্তির বণ্টনে আগে যেটা ছিল তাতে— একজন স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির অর্ধেক শেয়ার নিতে পারবেন যদি তারা নিঃসন্তান হন। এবং সন্তান থাকলে তা হবে এক চতুর্থাংশ। অথচ একজন স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ শেয়ার পাবেন যদি তারা নিঃসন্তান হন এবং সন্তান থাকলে তা হবে এক অষ্টাংশ। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্য স্পষ্ট। তা ছাড়াও Doctrine of representation বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ছিল। যা মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের আওতাতেও ছিল না। ধরি, একজন ব্যক্তি এ, যার দুটি পুত্র বি ও সি। এখন বি-এর দুটি সন্তান ডি, ই এবং সি এরও দুটি সন্তান এফ, জি। যদি এ-এর জীবদ্দশায় বি-এর মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে কী হবে? সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র সি, এ-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে। বি-এর সন্তানদ্বয় এ-এর সম্পত্তির কোনো অংশই পাবে না। এতো একরকম বৈষম্য এবং জটিলতার ইন্ধন ক্ষেত্র।

এই সব ছুঁতোয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির মহিলা সদস্যদের সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের ভীতিতে তারাও অনেক সময় বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার সাহস পান না। মেনে নেন অবৈধ বহুবিবাহ। কখনও ভোগ্য বস্তুর মতো নীরবে সংসারে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হতেন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ফলে পরিবারের একজন বঞ্চিত সদস্য আইনের বল সহায়তা পাবেন।

যে আইনে শরিয়ত একপেশে নিষ্পেষণমূলক বিধি নেই বরং ন্যায্য যুক্তিতে রচিত আইন বলিষ্ঠ করবে নাগরিক সম্মান সুরক্ষা।

মুসলমান নিজস্ব আইন দত্তক গ্রহণের অধিকার দেয় না। কিন্তু সদ্য মহামান্য দিল্লি শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেন যে, একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সন্তান দত্তকের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকটি ভারতীয়কে সুষ্ঠু বিচার এবং জীবন অধিকার পেতে হলে নিজস্ব ধর্মীয় আইনের কবল থেকে নিষ্কৃতি নিতেই হবে। কারণ দেশ প্রত্যেককে সংবিধানের বলে সুরক্ষিত রাখে।

শুধু তাই নয়, জুলাই ২০১৪, ভারতীয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় একটি উল্লেখযোগ্য রায় প্রদান করেছিলেন। যা উল্লেখ করেছিল— শরিয়ত আইনের কোনো লিগেল অথোরিটি নেই। কিন্তু মহামান্য আদালত শরিয়ত কোর্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। রায়টি দেওয়া হয়েছিল ২০০৫-এর একটি পিটিশনের ভিত্তিতে। যেখানে উল্লেখ ছিল জনৈক মুসলমান মহিলার বিবাহ অকার্যকর করা হয় এবং তার ধর্ষক শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে সহবাসের আদেশ দেয় অমানবিক অশিক্ষিত শরিয়ত কোর্ট। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পিটিশনার মহামান্য শীর্ষ আদালতের শরিয়ত আইনের অবসান আবেদন করেন। তাতে মহামান্য শীর্ষ আদালত স্পষ্ট রায় দেন 'no religion including Islam, encouages people to punish innocents through decrees not sanctioned by law.'

এর সঙ্গে উল্লেখ ছিল— এর পরেও কেউ স্বেচ্ছায় শরিয়ত আইনের অভ্যাসে থাকলে তাতে কোর্ট বাধা দেবেন না। শরিয়ত আইন যতবার আদালতের মুখে পড়েছে ততবারই মুখ থুবড়ে তার অমানবিক নিষ্ঠুর নিষ্পেষণমূলক রূপটি নগ্ন করেছে। জয়ী হয়েছে সংবিধানের শক্তি। এবার পালা সেই শরিয়ত আইন বা টুকরো টুকরো কোনায় এদিকে ওদিকে থাকা সব নিজস্ব আইনকে অবৈধ ঘোষণা করে অভিন্ন দেয়ানি আইন প্রণয়ন করার।

বলিষ্ঠ এক নিবন্ধ পড়েছিলাম, জাকিয়া সোমানের। যেখানে তিনি বারবার বলছেন একজন মুসলিম মহিলা বলেই তো আমি অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে চাই। যেখানে তিনি উল্লেখ করছেন, 'Although UCC concerns all citizens across gender, faith and

ethinicites, it is made to appear as a predominantly Muslim concern... 'যে কথা নানান ভাবে বলা হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে— তা হলো— Parity of Law; অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শুধুমাত্র সেই কাজটাই করবে। সংবিধানের Fundamental Rights এবং Directive Principle-এর মধ্যে একটা ভারসাম্য হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, তা কখনওই বিরোধ ঘটাবে না। যার জীবন্ত উদাহরণ গোয়া। সেখানে জনজাতি রয়েছে। খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলমান সবাই আছেন। কিন্তু ও রাজ্যে নিজস্ব আইন নেই। সংবিধানের মর্যাদায় সবাই চলে। তবে কি সেখানে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত? অভিন্ন দেওয়ানি আইনে প্রতিটা ভারতবাসী আসলেই বরং নিজস্ব ধর্ম পালনে শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি ভাবে। ধর্মাচার ও দেওয়ানি বিধি দুই মেরুর গল্প। তাই কেউ কাউকে বিরক্ত করবে না। ১৮৪০ সাল, অভিন্ন আইন গুরুত্ব পেল কোন ক্ষেত্রে? ক্রিমিনাল ল-তে। ব্রিটিশরা এদেশে এসেছিল সাম্রাজ্যের বিস্তারে। তাই অপরাধ প্রতিরোধে হিন্দু মুসলমান সবাইকে এক বিধানের আওতায় আনল। অপরাধ কি কেবল খুন জখম চুরিটুকুই? ইসলামের কিছু বুঝে বাকিটা না বুঝে যখন হাজার হাজার মহিলাকে স্বামীরা পরিত্যক্ত করছে। যখন অসংখ্য শাহাবানু নীরব। বিচার পায় না। ৬৮ বছরের আয়েসউম্মা বিধবা হলে সম্পত্তি এবং ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। তা কি অপরাধ নয়? ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ বলে আইনের চোখে সবাই সমান। তবে কেন ধর্ম (Religion) ন্যায়ের থেকে চোখ ঘোরাবে। রাষ্ট্রের Conflict of Interest যদি প্রকৃতই সরাতে হয় তবে অভিন্ন দেওয়ানি দাওয়াই একমাত্র গতি।

সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ উদ্বোধিত হওয়ার অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে মানবাধিকার বিকিয়ে যেতে পারে না। বিধি রেওয়াজের কাছে মানবাধিকার কলের পুতুল হয় না কোনো সত্য উন্নত দেশে। ভারতের এক অংশের মানুষের আইনের সঙ্গে সংবিধানের সঙ্গে অভ্যাসবিরুদ্ধতা রয়েছে, যা রাষ্ট্র চেতনার গোড়ায় গলদ। ঐক্যসাধনার মন্ত্রে দীপ্তিমান অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। কারণ আইন এবং সংবিধানের কাজ 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'— যা সবাইকে শুভবুদ্ধিতে সংযুক্ত করে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
ঠিক কী ধরনের বদল আসতে চলেছে?

বিমলশঙ্কর নন্দ

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আবার গোটা ভারতে সংবাদ শিরোনামে। গত ২৭ জুন ২০২৩ তারিখে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেশ জুড়ে সকল জনগোষ্ঠীর জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : 'ভারতের মুসলমান ভাই বোনেদের এটা বুঝতে হবে যে কোন কোন রাজনৈতিক দল তাদের ভুল বুঝিয়ে ফয়দা তোলার চেষ্টা করছে। আমারা দেখছি ইউসিসি-র নাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন : 'যদি পরিবারের এক সদস্যের জন্য একটি আইন আবার পরিবারের অন্য সদস্যের জন্য আর একটি আইন থাকে— এই ব্যবস্থায় কীভাবে দেশ চলবে? সংবিধানে ভারতের নাগরিকদের জন্য সমান অধিকারের কথা বলা আছে।'

ভারতীয় সংবিধানে একদিকে যেমন সকলের জন্য সমানাধিকারের কথা বলা আছে অন্যদিকে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে ১২-৩৫ ধারায় দু' প্রকার মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধান নির্ধারিত ব্যতিক্রম বাদ দিলে জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক অবস্থা বা লিঙ্গনির্বিশেষে সকলেই এই অধিকারগুলি সমানভাবে ভোগ করতে পারে। আবার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অংশে ৩৬-৫১ ধারায় কিছু নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলি দেশ পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি। সংবিধানের ৪৪ ধারায় সংবিধান দেশকে নির্দেশ দেয় ভারতের নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু

করার। সংবিধানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অনুচ্ছেদটি রাখা হবে কি না, সে নিয়ে গণপরিষদে বিস্তর আলোচনা হয়। ২৩ নভেম্বর ১৯৪৮ তারিখটিতে এ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পক্ষে বিপক্ষে দশজন সদস্য বক্তব্য রাখেন। অধিকাংশ মুসলমান সদস্য এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করেছিলেন, এই যুক্তিতে যে এই বিধির প্রয়োগ হলে মুসলমান পারিবারিক আইন বলে কিছু আর থাকবে না। কিন্তু মুসলমান পারিবারিক আইনে নারী কীভাবে সমানাধিকার পাবে, সে ব্যাপারে তাঁরা নীরব ছিলেন। গণপরিষদ সদস্য নাজিরুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য ছিল : 'নিঃসন্দেহে একদিন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মেনে নেব। কিন্তু সেই সময় এখনো আসেনি।' অনুচ্ছেদটি গৃহীত হয়। তবে বিধির প্রণয়ন ও প্রয়োগের দায়িত্ব সংসদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয় সে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এক সার্বিক ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। ততদিন দেশকে এই বিষয়টি মনে করিয়ে রাখবে ৪৪নং ধারার এই সংক্রান্ত নির্দেশমূলক নীতিটি।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর থেকে ৭৩টি বছর পেরিয়ে গেছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়নি দীর্ঘদিন কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। জনতা পার্টির সরকার কিংবা অন্যান্য জোট সরকারও এ ব্যাপারে নীরব থেকেছে। আইন প্রণয়নের উদ্যোগ তো দূরের কথা, এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপ আলোচনার প্রচেষ্টাও চালানো হয়নি। কেবলমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি কিংবা তার পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘ দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে প্রথম থেকেই। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পক্ষে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা সম্ভব হয়নি জোট রাজনীতির বাধ্যবধকতা এবং সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবের কারণে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি কখনোই তার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেনি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতীয় জনতা পার্টি তার নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করেছিল : 'বিজেপি বিশ্বাস করে যে— যতক্ষণ না ভারত একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লিঙ্গ সমতার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, যা সকল নারীর অধিকারকে সুরক্ষিত করে। বিজেপি প্রচলিত শ্রেষ্ঠ প্রথাগুলিকে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে সমন্বিত করার মাধ্যমে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া তৈরির জন্য তার অবস্থানকে পুনর্ব্যক্ত করছে।' কংগ্রেস-সহ সব দলের যুক্তি ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলনের আগে একটি সার্বিক ঐকমত্য গড়ে তোলা। কিন্তু ঐকমত্য কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। এর জন্য উদ্যোগ নিতে হয়।

কিন্তু কংগ্রেস কিংবা প্রগতিশীলতার স্বঘোষিত ঠিকাদার বামপন্থীরা এই উদ্যোগ কোনোকালে নেয়নি, বরং এ ব্যাপারে সব উদ্যোগ বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে স্থান পাওয়ার কারণে এগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। ফলে একের পর এক সরকার একে অবহেলা করার সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস কিংবা অন্যান্য অবিজেপি দল যারা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন ছিল তারা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করেছে। নির্দেশমূলক নীতিগুলি দেশের শাসন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য এবং এই নীতিগুলিকে আইন প্রণয়নের কাজে লাগানো দেশের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত তাৎপর্যটি মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকার মামলায় স্বীকৃত হয়েছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং এই সামঞ্জস্য সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একাধিকবার ভারতের সর্বোচ্চ আদালত একাধিক মামলার রায় দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করতে বলেছে। ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলায় (মহম্মদ আহমেদ খান বনাম শাহবানু বেগম) সর্বোচ্চ আদালত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করে। তৎকালীন রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন না করে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ১৯৮৬ সালে মুসলিম মহিলা বিল পাশ করায় সংসদে। এরপর ১৯৯৫ সালে সরলা মুদগল মামলায় ভারতের সুপ্রিমকোর্ট আবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করে। এছাড়াও লিলি টমাস বনাম ভারত সরকার মামলায় এবং আরও কয়েকটি মামলায় রায়দানকালে সর্বোচ্চ আদালত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

২০১৭ সালে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ব্যক্তিগত আইন সংশোধন করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিপরীতে ভারতে ১৬টির মতো ব্যক্তিগত আইন কার্যকর আছে। কোনো কোনো পারিবারিক আইনে বহু পরিবর্তন এসেছে, লিঙ্গবৈষম্য বিশেষ নেই। অন্যগুলিতে পরিবর্তনই আসেনি। যেমন, হিন্দু কোড বিল পাশ হওয়ার পর এবং ধাপে ধাপে তার সংশোধনী হওয়ার ফলে সেটিতে নারীদের সমানাধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান পারিবারিক আইনের সংশোধন হয়নি বললেই চলে। মেয়েদের প্রাপ্য সেখানে পুরুষের অর্ধেক বা তারও কম। কোনো কোনো বিষয়ে নারীদের অধিকার পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। মুসলমান পারিবারিক আইন সংশোধনের সম্ভাবনাও কম। কারণ মুসলমান ব্যক্তিগত আইন এখনো বিধিবদ্ধ বা কোডিফায়েড নয়। এক্ষেত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণীত হলে তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে প্রচলিত আইন ব্যবস্থায় কী ধরনের বদল আসতে পারে? এই বিধি কার্যকর হলে বাতিল হবে সব পারিবারিক আইন। পারিবারিক বিষয়ে সব ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার থাকবে। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অংশ নারীর প্রাপ্য হবে। ধর্ম নির্বিশেষে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হবে। সব সম্প্রদায়ে নাবালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ, বহুবিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। সমস্ত ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ হবে আদালতের মাধ্যমে। আদালতের বাইরে বিবাহ বিচ্ছেদ বন্ধ হবে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও দত্তক নেওয়ার, সন্তানের অভিভাবক হওয়ার অধিকারী হবে। অর্থাৎ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, খোরপোষ, অভিভাবকত্ব, দত্তক নেওয়া, উত্তরাধিকার অর্থাৎ মানুষের পারিবারিক এবং সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়গুলি সিভিল কোড'বা দেওয়ানি বিধির আওতায় আসে। বর্তমান ভারতীয় আইনে এগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও পার্শি বিবাহ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ব্যভিচার একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন আইনে ব্যভিচারের সংজ্ঞা বা অর্থ পৃথক। খ্রিস্টান আইনে কোনো মহিলাকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ পেতে গেলে স্বামীর ব্যভিচারের পাশাপাশি নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দিতে হয়। মুসলমান আইনে আবার কোনো খারাপ ভাবমূর্তির মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার কিংবা কলঙ্কময় জীবনযাপনের প্রমাণ দিতে না পারলে কোনো মহিলা স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ পান না। হিন্দু আইনে ব্যভিচারের কারণে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী বিচ্ছেদ পেতে পারেন। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ পেতে গেলে ব্যভিচারের পাশাপাশি নিষ্ঠুরতা এবং পরিত্যাগের প্রমাণ দিতে হয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এই সব ক্ষেত্রেই সমতা আনবে।

ভারত একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এখানে আছে নানা সংস্কার, রীতি-নীতি এবং আচার অনুষ্ঠান। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের সময় এগুলিকেও মাথায় রাখা হবে। বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি, জনজাতি বা সম্প্রদায় তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রথা মানতেই পারে। কিন্তু সেগুলি আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। নারীদের সমানাধিকার কোনো ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা চলে না। আইন হবে প্রগতিশীলতার দ্যোতক। তা যেন অগ্রগতির পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকে শুরু থেকে ইউরোপের দেশগুলিতে অভিন্ন আইন ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮০৪ সালের ফরাসি কোড সেই সময় প্রচলিত সব ধরনের প্রচলিত প্রথাগত কিংবা ব্যক্তিগত আইনকে নির্মূল করে চালু করা হয়। একে একে ইউরোপের সব দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়ে গেছে। সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষকে সেই আইন মেনে চলতে হয়। যারা ইউরোপে অভিন্ন আইন মানতে অভ্যস্ত তারা ভারতে ব্যক্তিগত আইন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে এত সওয়াল করে কেন? এই ভণ্ডামি এখন সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কোনো বিকল্প নেই। ■

আত্মঘাতী লেমিং এবং ওরা, আমরা

নারায়ণশঙ্কর দাশ

কথাটা হলো বঙ্গপ্রদেশ স্বাধীনতা-পূর্বকালে বারুদের স্তূপেই ছিল, এখনও আছে। ভবিষ্যতে থাকবে কী থাকবে না, সে ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে মন্তব্যে নয়। একথা ঠিক, বঙ্গপ্রদেশে বারুদের স্তূপে ছিল বলেই ভদ্র, সভ্য ব্রিটিশরা ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরিত করে। আর এখনও যে পোকায় কাটা পশ্চিমবঙ্গ যা শ্যামাপ্রসাদ উগ্র পাকিস্তানপন্থী জিহাদিদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, সেই পশ্চিমবঙ্গও এখন বারুদের স্তূপে, সেকথা অতি বড়ো অবিশ্বাসীও বিশ্বাস করে। প্রাক্তন NSG Commander এবং RAW Officer দীপাঞ্জন চক্রবর্তী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন— 'অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ৮০ হাজার জিলোটিন স্টিক এবং ২৮ হাজার কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হয়েছে যা দিয়ে নাকি আট হাজার স্থানে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব।' অথচ সভ্য ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসে, ভয়ংকর, নির্মম সামাজিক সংস্কার সতীদাহ প্রথার চির বিলুপ্তি ঘটিয়ে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় জারিত হয়ে এই বঙ্গপ্রদেশ সারা দেশের ক্ষেত্রে নবজাগরণের দিশারি হয়েছিল। সারা দেশের থেকে সম্ভ্রম আদায় করতো এই কলকাতা— যা ছিল একাধারে বাণিজ্যনগরী, শিল্পনগরী, প্রাশাসনিকনগরী এবং সাংস্কৃতিক নগরী।

এই বঙ্গে এশিয়ার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ, প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এবং ইউরোপ মহাদেশের বাইরে বাঙ্গলাতেই প্রথম নোবেল লরিয়েট, অথচ আত্মঘাতী লেমিং প্রজাতির মানুষেরা সভ্য ব্রিটিশের দিকে তাকিয়ে কখনোই বলে না, 'তোমারে যে দিয়েছিনু, সে তোমারই দান/গ্রহণ করেছ যত, ঋণী ততো করেছ আমায়।' বরং উলটে যাঁরা বুলডোজারের তলায় দুমড়ে দিয়েছিল তুর্কমান গেট ও ভারতবর্ষের শরীর, যেসব হার্মাদ অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে এসে স্থাপন করেছিল শ্লেভ ডাইনাস্টি, চাপিয়েছিল অমানবিক জিজিয়া কর, যে বারুদের সাম্রাজ্যের অনুপ্রেরণায় ভাঙা হয়েছিল অসংখ্য পবিত্র উপাসনা স্থল। তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষোভ লেমিং প্রজাতির আত্মঘাতী সম্প্রদায় ভুলেও প্রকাশ করে না বা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে কথা! এছাড়া স্বাধীনতার পর এদেশের ইতিহাসটাই হয়তো পালটে দেওয়া হয়েছে বলে অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। এসব দেখে শুনে বলতে ইচ্ছে হয়, 'সত্য সেলুকাস। কি বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ।' মহামতি গোখলের 'What Bengal thinks today, India will think tomorrow' উক্তিটির বেশ কিছুকাল পর থেকে এবং স্বাধীনতার বেশ কিছু আগে থেকে যে বাঙ্গলায় বিপরীত দিকে চলার শুরু, সে ধারা এখনও বজায় রয়েছে। এটাই দুর্ভাগ্যজনক। রাজনৈতিক হিংসা, সামাজিক হিংসা, খুন, ফাঁকিবাজি, স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বগ্রাসী দুর্নীতিতে এখন এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। এ জিনিস তো একদিনে বা বিগত দশ বছর সময়ে গড়ে ওঠেনি। গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। আপাতদৃষ্টিতে তবু বলা যায়, স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশক, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তার গরিমা কিছুটা হলেও বজায় রেখেছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে মন্দের ভালো ছিল। আর্থিক ক্ষেত্রে যেমন সিদ্ধার্থ জমানার অবসানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগারে ঘাটতি ছিল ৩০০ কোটি প্লাস। এরপর বাম জমানায় শেষে, ২০১১ সালে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটিতে। আর এখন ২০২৩ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লক্ষ হাজার কোটিতে। কর্মসংস্থানমূলক এবং গঠনমূলক কাজে সরকারি ব্যয় সংকুচিত হয়ে বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে ভোটমুখী জনমোহিনী ব্যয় ক্ষেত্রে। যদিও কী রাজ্য কী কেন্দ্র, সব সরকারই ঋণ নিয়েই দেশ চালাচ্ছে। প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ঋণ ১৪৭ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে ৪৩ লক্ষ কোটি হলো বৈদেশিক ঋণ।

তবে আশার কথাও রয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারা ভারতে জিএসটি খাতে রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। লক্ষণীয়, প্রতিটি রাজ্য থেকে জিএসটি বাবদ কেন্দ্র সরকারের যে টাকা উঠে আসে, তার প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট রাজ্যটি পেয়ে থাকে। আগে এ ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ অর্থ প্রাপ্তিতে বহু রাজ্যের তুলনায় অনেক ওপরের দিকে। স্বাধীনতার আগে অন্যান্য

রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গে আসতো বিভিন্ন চা-বাগান ও কলকারখানায় কাজের সন্ধানে। এখন উলটে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে যাচ্ছে ৪৮ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষ। বাম জমানায় ইউনিয়নবাজির ফলে অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। আয় তার ফলে হ্রাস পেয়েছে। আর রাজস্বের যা থাকে, সেটা রাজ্যের অধিকাংশই সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতেই যায়। কোষাগারে অপ্রতুলতা হেতু, লক্ষ লক্ষ পদের অবলুপ্তি ঘটে চলেছে ক্রমাগতভাবে।

পাশাপাশি এ রাজ্যের রাজনীতিতে বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। ফলে অতি সরল, সাধারণ, রাজনীতি না বোঝা বহু মানুষ কেবল পেটের দায়ে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, বিভিন্ন লোকাল বডির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মনে হচ্ছে, নির্বাচনী সম্মুখ সমরে কোমর বেঁধে দাঁতে দাঁত চেপে এ যেন বেঁচে থাকার লড়াই। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে দেখা গেছে রাজনীতিকে হাতিয়ার করে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের গ্রামে গ্রামে লাল ঝান্ডা গেড়ে জমি দখলের লড়াই, আর এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পঞ্চায়েতের নামে আপন আপন দলীয় রাজনীতি কায়েমের জন্য গ্রাম দখলের লড়াই। অতীতে লালঝান্ডা গেড়ে জমি দখলের লড়াইকে অনেকে হিংসার রাজনীতি বলেন। কমিউনিজম যে হিংসার ফসল, সেটা সমগ্র বিশ্ব বিশ্বাস করে। কেননা মাও-জে-দং-এর নেতৃত্বে লংমার্চের মাধ্যমে চীনের ক্ষমতা দখল এবং ফলস্বরূপ ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আবির্ভাব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ যুক্তি দেখিয়েছিল যে কমিউনিস্ট চীন হিংসার ফসল। যেহেতু রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলা, সেহেতু বলা হলো রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের অন্তর্ভুক্তি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির সাধু উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করবে। তাছাড়া ফরমোজা চীন যেহেতু ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য, সেহেতু আর নতুন করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। শেষ পর্যন্ত অনেক টালবাহানার পর ১৯৭১ সালে ফরমোজা চীনের নাম পালটে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে নতুন যা দেখা যাচ্ছে, সেটা হলো পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি, ভোট না দিয়ে জেতা, সাহিত্য না জেনেও বিভিন্ন বড়োসড়ো সাহিত্য পুরস্কার পাওয়া।

স্তুতি কিংবা মিথ্যা গর্বে প্রকৃত জিনিসকে না ঢাকাই ভালো। আবার নিরাশাবাদীর মতো থমকে না গিয়ে এগিয়ে চলাই শ্রেয়। রোদ, মেঘ, বৃষ্টি যেমন সাধারণ নিয়মে ঘটে, তেমনি একটি জাতির উত্থান ও পতনও সাধারণ নিয়মে আসে। পূর্ব রণাঙ্গণে শত শত বাধা, হাজার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেমন বলেছিলেন, আমরাও সেভাবেই বলবো,— 'I am born optimist, I shall not admit any defeat under any circumstances'. কারণ ভারতের স্বাধীনতা তো নেতাজী আমাদের দিয়ে গেছেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ১৯৫৬ সালে কলকাতার রাজভবনে দিন দুয়েক থাকাকালীন তৎকালীন রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীর ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেছিলেন, 'It was because of war time activities of the Indian National Army of Netaji Subhash Chadra Bose'। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যা সেটা হলো, স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, ডেমোক্রেসির নামে হাইপোক্রেসি চলছে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে। তাইতো শ্যামাবাজার পাঁচ মাথা মোড়ে গেলে নাকি এখনো শুনতে পাওয়া যায় সেই বিপ্লবী পুরুষের বজ্র কণ্ঠ, যা কবি শুভ দাশগুপ্ত কবিতায় জানিয়েছেন, 'আমি তোমাদের কাছে রক্ত চেয়েছিলাম/ তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো বলে/ ...আমি আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি/আর তোমরা? —তোমরা?'

সক্ষম-এর উদ্যোগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ১ জুলাই সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্ত এবং জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে জলপাইগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া বিশ্বাস পেট্রল পাম্পের বিপরীতে দিশারি ক্লাবের নিকটে জলপাইগুড়ি দিব্যাঙ্গ সেবা কেন্দ্রে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মদিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেরা দেশভক্তিমূলক গান, নাচ ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সেবা করে চলেছেন এমন বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে সক্ষমের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের হাতে সক্ষমের মেমেন্টো ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে শ্রীগুরুপূর্ণিমায় শিল্পী সাধকদের সম্মাননা

গত ৩ জুলাই শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে ললিতকলা ও সাহিত্যে সমর্পিত অখিল ভারতীয় সংস্থা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে ১০ টি জেলার ১৯ জন শিল্পী সাধককে সম্মাননা জানানো হয়। সেই সঙ্গে নটরাজ পূজনেরও আয়োজন করা হয়।

সংস্কার ভারতী কোনো ব্যক্তিকে নয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রূপক নটরাজকেই গুরু হিসেবে বন্দনা করে। সুর-তাল-লয়-ছন্দে নটরাজের যে অবস্থান, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি। মানব কল্যাণের নিমিত্তে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবোধগুলি যে শক্তির মাধ্যমে জাগ্রত হয় তাকেই সংস্কৃতি বলা হয়ে তাকে। জগতের আনন্দযজ্ঞে নব নব সৃষ্টির যে বাসনা তাই লাস্য। আবার জগৎ শুদ্ধিকরণে নব সৃষ্টির প্রেরণায় তিনিই প্রলয়ের কারণ। সৃষ্টির কারণেই ধ্বংস এবং ধ্বংসের মাঝেই নব নব সৃষ্টির প্রকাশ। এটাই ভারতবর্ষের চিরন্তন রূপ। তাই গুরুপূর্ণিমা উৎসবের দিনে সংস্কার ভারতী আয়োজন করে থাকে নটরাজ বন্দনার। দেব-দানব-মানব— সকলের আরাধ্য গুরু নটরাজ। তিনিই সর্ববিদ্যার স্রষ্টা। তাঁর নৃত্যের ছন্দে গড়ে ওঠে নব নব সৃষ্টি; সূচিত হয় মহাপ্রলয়। সেই সংস্কৃতির আদিগুরু নটরাজের প্রতিভূ হিসেবে কোনো শিল্পগুরুকে শ্রদ্ধা ও সম্মাননা জানানোর প্রথা সনাতন ভারতে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত জানান, এইদিনে সংস্কার ভারতী প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে নীরবে সংস্কৃতির সাধনা করে যাওয়া এমন ১৯ জন সাধককে শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মানিত করেছে। তাঁরা হলেন উত্তর ২৪পরগনা জেলার সংগীত শিল্পী খগেশ কীর্তনীয়া, নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত; দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সরোদবাদক সৌগত গঙ্গোপাধ্যায়, ওড়িশি নৃত্যশিল্পী মোনালিসা ঘোষ ও অধ্যাপক হিমাদ্রিশেখর সরকার; নদীয়া জেলার কীর্তনীয়া সরস্বতী দাস, নৃত্যশিল্পী কাজল দাস ও অভিজিৎ গুপ্ত; মেদিনীপুর জেলার নাট্যকার চন্দ্রশেখর দাস ও নৃত্যশিল্পী সবিতা মিত্র; হাওড়া জেলার নাট্যশিল্পী শ্যামল দাস ও নৃত্যশিল্পী ঋতা ঘোষ; বর্ধমান জেলার শিক্ষক বিবেকানন্দ প্রামাণিক; বীরভূম জেলার পটচিত্রশিল্পী লাল্টু চিত্রকর; বাঁকুড়া জেলার সংগীতশিল্পী সুভাষ কর্মকার; দক্ষিণ কলকাতা জেলার সংগীতশিল্পী কৃষ্ণা মজুমদার ও নৃত্যশিল্পী নীলিমা রায়; উত্তর কলকাতা জেলার সংগীতশিল্পী মণিকা দত্ত ও চিত্রকর সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত।

রামপ্রসাদের তন্ত্রসাধনা ছিল মাতৃসাধনা

দীপক খাঁ

প্রত্যেক সাধকের একটি ধর্মদর্শন থাকে। কেউ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো গুহার ভেতরে বসে সাধনা করেন। আবার কেউ সর্বজন সমক্ষে সাধনালব্ধ ফল বিতরণ করেন। যা কিছু সঞ্চয় করেন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন। রামপ্রসাদ দ্বিতীয় দলভুক্ত মাতৃসাধক। কবি রামপ্রসাদের বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো— মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা। যখন কোনো জীব কাঙ্ক্ষিত ও ঈপ্সিত যুক্তির সন্ধানে পা রাখেন তখন যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে জীব ও পরমাত্মা অভিন্ন। রামপ্রসাদের একটি গান শুনলেই তাঁর সাধনা সম্পর্কে বোঝা যায় :

'বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যতে পাপ গণ্য মান্য
করে সবে খেয়ালে।'

রামপ্রসাদের ধর্মদর্শনের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বজনে প্রেম। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন— তাঁর ধর্মসাধনা শুধু মাত্র 'প্রেম' শব্দটির উপর নিবদ্ধ। তিনি তন্ত্রসাধক ছিলেন সত্য। কিন্তু তন্ত্রসাধনার মধ্যে কোনো ভয়ংকর রসের সঞ্চার ঘটেনি। তিনি গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসাকে পরম পাথেয় করে জীবনপথের পথিক হতে চেয়েছিলেন।

এক সময় বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে তান্ত্রিক সাধনা শুরু হয়েছিল। বিক্রমপুর থেকে হাজার তন্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে। এই সব বইয়ের প্রাচুর্য দেখে মনে প্রশ্ন জাগে কেন বাঙ্গালি সাধকেরা তন্ত্রসাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন? অনেকেই বলেন যে তন্ত্রসাধনার সঙ্গে শ্যামাপূজার নিবিড় যোগ দেখা যায়। বঙ্গদেশে এমন কোনো পল্লি নেই, যেখানে শ্যামামায়ের মন্দির নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন বাঙ্গালি কেন এত কালী ভক্ত হলো?

মহাভারতেই আমরা প্রথমে দেবী দুর্গার নাম পেয়েছি। দুর্গার একটি রূপ ভিন্ন কালী কিছুই নয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে উল্লেখ আছে মা দুর্গা থেকেই কালিকা মাতার উৎপত্তি। রক্তবীজ অসুরকে নিধন করে কালী এমন নৃত্য করেন যাতে সমগ্র ধরিত্রী প্রকম্পিত হয়। অবশেষে দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শায়িত হন। দেবী কালিকা নৃত্য করতে করতে হঠাৎ দেখলেন তিনি স্বামীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। অমনি লজ্জায় জিভ বের করে নির্বিকল্পভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন। এই ভাবেই কালী প্রতিমার রূপটি আমাদের চোখের সামনে প্রকটিত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে দেবী কালীকা বিভিন্ন নামে পূজিতা। বিন্ধ্যপর্বতে তিনি 'বিন্ধ্যাচলবাসিনী', বালুচিস্থানে 'হিংলাজ' আবার কালীঘাটে তিনি 'কালিকা'। সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ ছিল শক্তির পূজারি। এক একটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে তাঁরা এক একটি শক্তি হিসেবে মনে করেছেন। প্রাচীন মিশর, মেক্সিকো, আফ্রিকা ও ইউরোপে এই ভাবেই শক্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল।

রামপ্রসাদের অধ্যাত্মদর্শনের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা অবাক হই— শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও তিনি চিৎশক্তি, মায়াশক্তি এবং কুণ্ডলিনী শক্তির সম্মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, পরম তন্ত্রসাধক হয়ে রামপ্রসাদ ছিলেন মানবতার পূজারি। তন্ত্রের বিষয়গুলিকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন কিন্তু উৎকট পাপাচারকে বর্জন করেছিলেন। রামপ্রসাদের মতানুযায়ী, আমাদের মূল প্রকৃতির মধ্যে কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু চৈতন্য নেই। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে চৈতন্য আছে, কিন্তু কর্তৃত্ব নেই। তাহলে আমরা কি পরম্পরা থেকে আলাদা? নাকি আমাদের মধ্যে একটা অভিন্নভাব ফুটে উঠেছে? রামপ্রসাদ বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। তিনি অর্ধনারীশ্বর হিসেবে আমাদের নিকট প্রকটিত।

তিনি বলেছিলেন—

'জাকজমক করলে পূজা
অহংকার হয় মনে
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা

জানবে নারে জলাজ্জনে।'

এই দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রাণের আকুতি মিশে আছে। তখনকার দিনের বড়োলোকেরা পুজোর আড়ম্বরে নিজেদের অহংবোধকে প্রকটিত করতেন। কত অর্থের মালিক তা প্রতিপন্ন করতেন। আজও সেই ট্রাডিশন চলছে। কালীপূজাকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তুমূল প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

তাই রামপ্রসাদ বলেছেন—

'রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে
সচেতন থেকো মনরে আমার
কালী বলে ডেকো, এ দেহে ত্যজিবে যবে।'

এবার রামপ্রসাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের কথা না বললেই নয়। তিনি ছিলেন সমাজসচেতন মানুষ। অধ্যাত্ম জগতের বাসিন্দারা সমকালীন পৃথিবী সম্পর্কে নিস্পৃহ, তাঁরা স্বীয় জীবনের ভালো মন্দ নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু রামপ্রসাদ বিপরীত গ্রহের বাসিন্দা। রামপ্রসাদ যখন ভবলীলায় অংশ নিয়েছিলেন তখন সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে দেখা দিয়েছিল অরাজকতা। বঙ্গদেশ তখন মুসলমান শাসনকর্তাদের অধীন। তাঁদের অনেকেই দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। রামপ্রসাদের জীবনকালের মধ্যে একাধিক মুসলমান শাসক বঙ্গদেশের অধিকর্তা হয়েছিলেন। এসেছিলেন আলিবর্দি খাঁ, তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। ইংরেজদের সঙ্গে বাঙ্গলার নবাবদের সংঘর্ষ বেধে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে তার সমাপ্তি হয়।

এবার মিরজাফর নামে এক পুতুল নবাব কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর মিরকাশিম। মিরকাশিম স্বাধীনতাচেতা মানুষ। এসেছেন ক্লাইভ, তিনি একজন সুচতুর এবং ধূর্ত প্রশাসক। তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বাঙ্গলাদেশের গর্ভনর পদে নিযুক্ত করেছিলেন।

রামপ্রসাদের যখন জন্ম হয়, তখন মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন এখানকার প্রশাসক। যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন বাঙ্গলার শাসক হেস্টিংস। অর্থাৎ ইতিহাসের বেশ কয়েকটি কাল বিভাজনকে রামপ্রসাদ দেখেছিলেন। সমাজ সচেতন সাধক কবি হিসেবে তাঁর লেখনিতে গ্রামবাঙ্গলা মূর্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখছেন—

'অন্ন দে গো, অন্ন দে গো, অন্ন দে গো
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধার অন্ন
অপরাধ করিলে পদে পদে।'

ওয়ারেন হেস্টিংস্‌-এর মতো এক দক্ষ প্রশাসক থাকা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের সর্বত্র দুর্ভিক্ষের হাহাকার দেখা দিয়েছিল। মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে এই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের জীবন্ত বর্ণনা আছে।

সেই সময় রামপ্রসাদের কবি ভাবনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি দুঃখ করে বলেছেন :

'আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছে যে মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ এই সংসার সবারি।
ও মা, তুমিও কোন্দল করেছ বলে শিব ভিখারি।'

তিনি সর্বত্র করুণাময়ী মায়ের অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন। দুর্ভিক্ষের সেই ভয়ংকর মুহূর্তে অন্নবিহীন অবস্থায় সময় কাটাতে গিয়েও তিনি মাকে ভুলে যাননি। তিনি বলেছেন— হে জগজ্জননী মা, তুমি তো অন্নপূর্ণা। তুমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দাও। তুমি যদি ছেলের মুখে অন্ন দিতে না পারো, তাহলে তুমি কেমন মা?

রাম প্রসাদের আকুল আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই ভাবে :

'মরি গো এই মনের দুঃখে
ও মা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে?
এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কী বলবে লোকে?
ওই যে যার মা জগদীশ্বরী তাঁর
ছেলে মরে পেটের ভুখে।।'
সেকি তোমার সাধের ছেলে মা
রাখলে যারে পরম সুখে।
ও মা আমি কত অপরাধী,
নুন মেলে না আমার শাকে।।
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাহাড়
মারিলে আমার বুকে।
ও মা মায়ের মতো কাজ করেছে,
দেখবে জগতের লোকে।'

তিনি বার বার মায়ের কাছে কাতর আহ্বান করে বলেছেন— মা, তুমি আমার মুখে দুবেলা দু'মুঠো অন্ন তুলে দাও। আমি এই যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।

রামপ্রসাদের সময়সীমা বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পলাশীর যুদ্ধের অভিশপ্ত পরিণাম, প্রাকৃতিক তাণ্ডব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মিলেমিশে বঙ্গদেশকে নানাভাবে গ্রাস করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সময়সীমার বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই অরাজকতার মুহূর্তে রামপ্রসাদ ছিলেন মায়ের উপর নির্ভরশীল। তিনি অটুট আস্থা রেখেছিলেন শ্যামামায়ের প্রতি। □

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এবং মানবজীবন

দেবব্রত ঘোষ

সভ্যতা একটি বিশিষ্ট জীবনধারা। মানবত্মার এক অভিযান। কোনো জাতির জৈবিক একতা বা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার সারমর্ম পাওয়া যাবে না, যে সব মূল্যবোধ তাদের সৃষ্টি করে ও রক্ষা করে তাদের মধ্যেই সভ্যতার মর্ম নিহিত। প্রত্যেক সভ্যতা একটা ধর্মের বহিঃপ্রকাশ, কেননা ধর্ম মানেই পরম মূল্যে বিশ্বাস এবং তা লাভ করার জন্য জীবনচারণা। বিবেকানন্দ বিগত সহস্রাব্দে ধর্মকে ভারতবর্ষের একমাত্র সহায় বলেছিলেন।

আজকের বিদগ্ধ সমাজতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিজীবীদের একাংশের লেখায় ও কথায় বারবার উচ্চারিত হয় একটা কথা, 'ধর্মই নাকি মানুষে-মানুষে, সমাজে- সমাজে এবং দেশে-দেশে যাবতীয় বিবাদ ও বিরোধের প্রধান কারণ'। মার্কসবাদীদের কাছে ধর্ম মানে তো গরিব শ্রেণীকে আফিম খাইয়ে বুঁদ করে দিয়ে শোষণ চালিয়ে যাবার জন্য ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ পুরোহিতদের ষড়যন্ত্র মাত্র। সমকালীন মানসিকতা রুশোর Social Contract, মার্কসের দাস ক্যাপিটাল, ডারউইনের Origin of Species আর স্পেঙ্গলারের Decline of the West কর্তৃক সৃষ্ট যা শুধু ঐহিক জীবনের কথাই বলে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে রচিত মহাভারতের প্রমাণ দিয়েই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে ধর্মকে তার ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করলে এই লৌকিক জীবনকেই আমরা মহিমান্বিত করে তুলতে পারি। কেননা ফলিত তত্ত্বকথাই ধর্ম।

ধর্ম : যা সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম। ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়েতে প্রজাঃ (কর্ণপর্ব-মহাভারত)। এই মহাভারতেই বলা হচ্ছে ধর্মের দ্বারাই সকল জীবের বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয়— ধর্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা (শান্তিপর্ব-মহাভারত)। ধর্ম হলো সেই জিনিস যা সমস্ত লোকস্থিতিকে ধারণ করে রাখে— ধর্ম ধারয়তি প্রজাঃ উদ্যোগপর্ব-মহাভারত। মহাভারতে বলা হয়েছে ধর্মে তিষ্ঠতি ভূতানি (শান্তিপর্ব-মহাভারত)। আবার যা থেকে জীবনে সকল ধনের প্রাপ্তি ঘটে সেটাও ধর্ম— ধনাৎ স্রবতি ধর্মোঃ শান্তিপর্ব- মহাভারত। ধর্ম সেই মহাশক্তি যা সমস্ত জগৎ ও জীবনকে ধারণ করে রয়েছে। আবার যাকে অবলম্বন করে আমরা প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, পঙ্কিলতা, গ্লানি ও আত্মস্বার্থের ওপরে মহান উদার নিঃস্বার্থ ভালোবাসাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেটাও ধর্ম। ধর্ম বলতে ফুল-বেলপাতা-তুলসীপাতা, ফল-নৈবেদ্য-মন্ত্রোচ্চারণ বোঝায় না, মন্দির-মসজিদ-গির্জায় গিয়ে প্রার্থনাকেও বোঝায় না। ধর্মের প্রবেশপথ শান্তি, সমতা, দয়া, অহিংসা ও অমাৎসর্য। ধর্ম দাঁড়িয়ে রয়েছে ৬ পায়ে ভর দিয়ে— জন্ম থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, যৌবনে শোক, মোহ এবং বার্ধক্যে জরা ও মৃত্যু। ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর— সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ (শান্তিপর্ব-মহাভারত)। ভাবনায় উদারতা, কর্মে নিষ্কামতা, ভক্তিতে শরণাগতি, জ্ঞানে সর্বভূতে ব্রহ্মভাব, ধ্যানে চিত্তসংযোগ, নীতিতে সাম্যবুদ্ধি, উপাসনায় জীবসেবা, সাধনায় ত্যাগের অনুশীলন, জীবনযাপনে স্বধর্ম— এই হলো ধর্মের মূল কথা। সনাতন ধর্মে অমৃত বলতে চিরজীবী হওয়া বোঝায় না, মৃত্যুর মুহূর্তকে যা মধুর করে তাই অমৃত। দয়া শব্দের অর্থ হলো সকলের সুখের জন্য চেষ্টা করা, দান শব্দের অর্থ হলো যা সকলকে রক্ষা করে, ধৈর্য শব্দের মানে হলো নিজের ধর্মে ঠিক থাকা। যে শিক্ষা মানুষকে চিন্তাশীল, বিবেকবান ও হৃদয়বান করে, আপোশহীন করে, অপ্রেম থেকে প্রেমে, অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যায় সেটাও ধর্ম। ধর্মের অনেকান্ত সংজ্ঞা, অনেকান্ত রূপ। জীবনে সুখ ও শান্তির জন্য বাহ্যিক বস্তুর ওপর নির্ভর না করে যত ভেতরের ওপর আমরা অন্তর্জ্যোতি হবো, সেটাও ধর্ম।

অর্থ : অর্থও ভগবানের এক শক্তি। ধর্মের মূল যেমন অর্থ, তেমনি অর্থের মূলও ধর্ম। মহাভারতের বনপর্বে আছে— সর্বথা ধর্মমূলোহর্থো ধর্মশ্চার্থপরিগ্রহঃ। মহাভারতে অর্থকে ব্যাপক ও বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। যা কিছু আয়ত্ত করা যায় তাই অর্থ। অর্থ ও বিদ্যাকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ অর্থ (ধনানামুত্তমং শ্রুতম্ঃ শান্তিপর্ব-মহাভারত)। শক্তিমাত্রেই তার অপব্যবহারে ও অপপ্রয়োগে বিকার নিয়ে আসে। অর্থ যেহেতু শক্তি, তাই অর্থেরও বিকার ঘটে। মহাভারতে বারবার বলা হয়েছে অন্যায়পথে, অধর্ম উপায়ে অর্জিত অর্থের তো কথাই

নেই, ধর্ম পথে উপার্জিত অর্থ যদি অতিরিক্ত সঞ্চিত হয় তখনই তা লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ভয়, উদ্বেগ, কার্পণ্য-সহ বিবিধ পাপেরও জন্ম দেয়। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে— অতিবেলং হি যোহর্থার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি সবধ্যঃ সর্বভুতানাং ব্রহ্মহেব জগুপ্সিতা— তীব্র কামনার বশবর্তী যে কেবল অর্থ সঞ্চয় করে তার সদব্যবহার করে না সে ব্যক্তি পাপী, এমন ব্যক্তি সাক্ষাৎ নরকে যায় (সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজেত : শান্তিপর্ব-মহাভারত)। অথচ ধন উপার্জন এক তপস্যা ধনং প্রাপ্নোতি তপসা (অনুশাসন পর্ব : শান্তিপর্ব- মহাভারত)। জগৎকল্যাণ যজ্ঞের জন্য ভগবান অর্থকে সৃষ্টি করেছেন যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি যাত্রা, ধাতা দদাতি মর্তেভ্যো যজ্ঞার্থমিতি (শান্তিপর্ব-মহাভারত) অর্থ এক বিশ্বজনীন শক্তির স্থূল চিহ্ন। বাহ্যজীবনের পরিপূর্ণতার জন্য এই শক্তি অপরিহার্য। কারণ পৃথিবীতে এর ক্রিয়া প্রকাশ পায় জড় ও প্রাণের স্তরে এবং অর্থ ছাড়া ধর্মও অচল।

কাম : ধর্ম ও অর্থ থেকে কামের উৎপত্তি— প্রতিঃ সা হি কামস্য পাবকস্যারণির্যথা, কামঃ সংসারহেতুশ্চ (বনপর্ব-মহাভারত)। কাম মানে শারীরিক কামনা বা লালসা নয়। যে কোনো সংকল্পরূপ মানস ইচ্ছাকেই কাম বলে— সনাতনো হি সংকল্প কাম ইত্যভিধীয়তে, সর্বঃসংকল্পো বিষয়াত্মকঃ (অনুশাসনপর্ব-মহাভারত)। কামই জগৎ সৃষ্টির মূল। কামনা থেকেই আসে যে কোনো শিল্প, তা সাহিত্যই হোক কিংবা সংগীত বা যে কোনো চারুকলাই হোক, তার আদি কারণ কিন্তু কাম। তবে সেই কামেরও নিয়ন্ত্রণও থাকবে, কামকে শুদ্ধ করে নিয়ে জীবনে তার সেবা করার কথাই বলা হয়েছে— বিমুক্তস্তপসা সর্বাং ধর্মাদীন কামনৈষ্ঠিকান (শান্তিপর্ব-মহাভারত)। স্থূল জগতে কামের শারীরিক প্রকাশ ঘটে যৌন চেতনায়। সূক্ষ্মতর প্রাণিক জগতে কামের শারীরিক প্রকাশ ঘটে সামাজিক বিভিন্ন কর্মে (যার মধ্যে খেলাধুলোও রয়েছে)। সূক্ষ্মতম মনের জগতে কামের শারীরিক প্রকাশ চিত্রকলা, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, স্থাপত্যকর্ম, ভাস্কর্যকর্ম, অঙ্কনকর্ম ও সাহিত্যিককর্মের মধ্য দিয়ে। এই কামকে একেবারে ছেঁটে দিলে জগৎ ও জীবন কিছুই টেকে না, আবার এই কামকেই শোধন করে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে রাখলে জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। উপনিষদ কিংবা মহাভারতে কামকে একেবারে বর্জনীয় বলে ঘোষণা করা হয়নি বরং পরিশীলিত শিক্ষায় কামকে প্রেমে উন্নীত করা হয়েছে।

মোক্ষ : জীবন এক অস্থির সমুদ্র যেখানে সুখ ও দুঃখের ঢেউ উঠছে। জলের স্রোতে ভেসে চলা কাঠের টুকরোর মতো আমরা একবার পরস্পরের কাছে আসছি আবার পরমুহূর্তেই দূরে চলে যাচ্ছি। এর মধ্যে আপন-পর বলে কোনো কিছু নেই। যখন কোনো কিছুকে আমার বলে ভাবতে চাই, আমার বলে দাবি করি তখনই দুঃখ এসে চেপে ধরে। আসলে এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে আমি এক অখণ্ড সত্ত্বা। সমগ্র বিশ্বই আমার এবং আমিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই অনুস্যূত। এই ক্ষুদ্র আমিকে যখন আমি ছাপিয়ে যাবো তখনই পাবো বৃহৎ আমিকে। এই সুখ হলো ভূমাচেতনার সুখ। এই চেতনাই হলো পরম মোক্ষচেতনা। সংসারের মধ্যে থেকে যাবতীয় সাংসারিক কর্তব্য পালন করেও যিনি সংসারের ঊর্ধ্বে। মনের দিক থেকে সন্ন্যাসী আবার বন্ধনের মধ্যে থেকেও বন্ধনমুক্ত। তিনিই মোক্ষকে জেনেছেন। আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষহস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্, কিঞ্চন্যে চেতরে চৈব জন্তুজ্ঞানেন মুচ্যতে। তস্মাদ ধর্মার্তকর্মেষু তথা রাজা পরিগ্রহে, বন্ধনায়তনেস্বেষু বিদ্ধ্যবন্ধ্যে পদে স্থিতম (শান্তিপর্ব-মহাভারত)।

ভারতীয় শাস্ত্রে সপ্তলোকের কথা আছে। নিম্নচেতনায় অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল (মানব শরীরের দৈহিক গঠনের দিক থেকে যথাক্রমে উরুর ঊর্ধ্বাংশ, উরুর নিম্নাংশ, জানুর উর্ধ্বাংশ, জানুর নিম্নাংশ, গুলফ, গোড়ালি ও পদতল)। ঊর্ধ্বচেতনায় ভূলোক, ভূর্বলোক, স্বলোক, মর্হলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক (মানব শহীরের দৈহিক গঠনের দিক থেকে যথাক্রমে জংঘা, নাভি, বুক, গ্রীবা, মুখ, ললাট ও মস্তক)। আবার আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে সপ্তকোষে মানবাত্মার অবস্থানের কথা। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, চৈতন্যময় কোষ এবং সৎময় কোষ। শাস্ত্রে রয়েছে যে কোনো মানুষের পাঁচটি ঋণের কথা— দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ ও ভূতঋণ। কারণ আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য দেবতার কাছে ঋণী, জ্ঞানের জন্য ঋষিদের কাছে ঋণী, বেঁচে থাকার জন্য পিতৃপুরুষের কাছে ঋণী, সমাজ থেকে প্রাপ্য সহযোগিতার জন্য সমাজের কাছে ঋণী, দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রকৃতির কাছে ঋণী। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমাদের যা কিছু পরিণতি তাও সাতটি পরম্পরা থেকে উদ্ভুত— বিষয়চিন্তা থেকে লোভ, লোভ থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশ।

প্রতিটি মানুষের রয়েছে দেহ, প্রাণ ও মন যা সীমাবদ্ধ ও শান্ত। যেহেতু সকাল থাকলে সন্ধ্যা থাকবেই, দিন থাকলে রাত্রি থাকবেই, অতএব এমন কিছু বা কেউ একজন আছেন যিনি অসীম অনন্ত। শাস্ত্রে তাকেই বলা হয় সচ্চিদানন্দ। সীমাবদ্ধ দেহের উচ্চতর রূপ হলো সৎ (যা অসীম অনন্ত দেহবিশিষ্ট), সীমাবদ্ধ প্রাণের উচ্চতর রূপ হলো চিৎ (যা ক্ষয় ও জরাহীন অনন্ত প্রাণ), সীমাবদ্ধ মনের উচ্চতর রূপ হলো আনন্দ (যা সসীম ও সীমাবদ্ধ সুখের উচ্চতর রূপ)। এই ত্রিপুটিকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ যিনি কারুর কাছে ভগবান, কারুর কাছে পরব্রহ্ম, কারুর কাছে পুরুষোত্তম, কারুর কাছে পরমাত্মা। নিম্নলোকের তিন তত্ত্ব (দেহ-প্রাণ-মন), ঊর্ধ্বলোকের তিন তত্ত্ব (সৎ-চিৎ-আনন্দ) মিলিয়ে ছটি তত্ত্ব। উচ্চতর তিন চেতনার সঙ্গে নিম্নতর তিন চেতনার সংযোগ রাখার জন্য অবশ্যই থাকবে আরও একটি তত্ত্ব। এই সপ্তম তত্ত্বকে বলা হয় অতিমানস বা ঋত। উপনিষদে তাকেই বলা হয় মর্হলোক বা বিজ্ঞানময়লোক, যাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ভাবমুখ। আবার মানুষের শরীরে রয়েছে পাঁচটি তত্ত্ব যথা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ। উপনিষদে অস্তিত্বের চার অবস্থার কথা বলা হয়েছে। জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি-সমাধি আর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-মহাকারণ। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ স্থূল শরীরে বাস করে, স্বপ্নে সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে, গভীর ঘুম বা সুষুপ্তিতে কারণ শরীরে অবস্থান করে আর ধ্যানের গভীর অবস্থা যাকে সমাধি বলা হয় তখন জীব মহাকারণলোকের বাসিন্দা। এই তত্ত্বের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। □

আধুনিক ভারতে জনবিন্যাস পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হলো সাম্প্রদায়িক হিংসার বাড়বাড়ন্ত

অনির্বাণ দে

পেরিয়ে গেল ২০২৩ সালের ২০ জুন। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্যেই এটি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৪৭-এর এই দিনেই বঙ্গীয় আইন পরিষদে (অবিভক্ত বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভা) বঙ্গবিভাগের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাঙ্গলার আইনসভা রাজ্যটির পশ্চিম অংশকে ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসেবে নির্ধারিত করার পক্ষে রায় দেয়। এই ভোটাভুটির ফলাফলের ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়। মুসলিম লিগের সমগ্র বাঙ্গলাকে পাকিস্তানভুক্ত করার চক্রান্তকে রুখে দিয়ে সৃষ্টি হয় বাঙ্গালি হিন্দুর একমাত্র স্বভূমি বা হোমল্যান্ড। অপরদিকে পূর্ববঙ্গ হয় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এর দু'মাসের মাথায় অর্থাৎ ১৫ আগস্ট ইংরেজদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় ভারত। কিন্তু অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশকে খণ্ডিত করে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের প্রয়োজন হলো কেন? কী এমন ঘটল যে ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে ড. মেঘনাদ সাহা, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. যদুনাথ সরকারের মতো প্রখ্যাত বাঙ্গালি ব্যক্তিত্বকে এই বঙ্গবিভাগের পক্ষে প্রবলভাবে উদ্যোগী হতে হলো? তা জানার জন্য পিছিয়ে যেতে হবে স্বাধীনতার থেকে আরও একটি বছর। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট খাস কলকাতার বুকে শুরু হওয়া এক বীভৎস গণহত্যার ইতিহাস। এবং তার কয়েকমাস পরে আবার পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে। এই সকল ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকেই জন্ম নিয়েছিল ওই বাঙ্গালি হিন্দুর স্বভূমি আন্দোলন (Bengal Hindu Homeland Movement)। বস্তুত বহুত্বের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ শুধু মধ্যযুগ নয়, আধুনিক যুগেও এমন বহু হিংসার অভিশাপে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়েছে বারবার। তার প্রায় প্রতিটির নেপথ্যেই ছিল দেশের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়া একটি বিশেষ ধর্মান্ধ

কালিয়াচক, (ফাইল চিত্র)

কট্টরবাদ। এমন কয়েকটি ঘটনাকে ঘিরে এই আলোচনা।

ভারতের জনবিন্যাস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯ শতকের গোড়া থেকেই ব্রিটিশ ভারতের যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল প্রায় সব জায়গায়ই হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, এর জন্যেও দায়ী ছিল সুনির্দিষ্ট জেহাদি পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে হাতিয়ার করে এমন ভয়াবহ সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, যাতে পৃথক ইসলামি ভূখণ্ডের দাবি হিন্দুরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ড. আম্বেদকর তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, 'thing that is noticeable is the adoption by the Muslims of the gangster's method in politics. The riots are a sufficient indication that gangsterism has become a settled part of their strategy in politics.'।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রকৃত সমস্যার গোড়ায় পৌঁছনোর পরিবর্তে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল যেনতেন প্রকারণে হিন্দু-মুসলমানের বাহ্যিক ঐক্যের এক কৃত্রিম ছবি তুলে ধরা এবং বকলমে সেই কট্টরপন্থা যার প্রধান স্থপতি ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু জেহাদি শক্তির সঙ্গে আপোশ করার মরিয়া চেষ্টায় অকাতরে হিন্দু স্বার্থ ও হিন্দু জীবন বলিদান দিয়েও ধর্মান্ধ মানুষগুলির মনোভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় (থ্রু ইন্ডিয়ান আইজ, ২১.০৩.১৯২৪) জাতীয় কংগ্রেসের ৩৪তম সভাপতি এবং মুসলিম লিগের ১৪তম সভাপতি মহম্মদ আলি জওহরের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য— 'Yes, according to my religion and creed I do hold an adulterous and fallen Musalman to be better than Mr. Gandhi.' কারণ শত হলেও গান্ধী ছিলেন কাফের।

দেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে জাতীয় নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতির ফল ভুগতে হয় উভয়কেই। আর্য সমাজের প্রবীণ সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যখন ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় হিন্দু শুদ্ধি মহাসভা

ফ ঃ ৫

পরিচালিত শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনছিলেন এবং অস্পৃশ্যতা দূর করে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনছিলেন সেই সময়ে ১৯২৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আব্দুল রশিদ নামক এক জেহাদি তাঁর বাসস্থানে ঢুকে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁকে সামনে থেকে বুকে গুলি করে হত্যা করে। অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায় শুদ্ধি আন্দোলনের। অনেকের মতে আব্দুল রশিদ ছিল প্রথম সন্ত্রাসবাদী। গান্ধীজী সেই নরহত্যাকারী আব্দুল রশিদকেই কার্যত সমর্থন করে মন্তব্য করে বলেন— 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা তাঁর জন্য একটি আশীর্বাদস্বরূপ, কেননা স্বামীজী ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছিলেন, এমনিতেই তিনি বেশিদিন বাঁচতেন না। কিন্তু কোনো হিন্দু যদি আবদুল রশিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোনও মুসলমানকে হত্যা করে তাহলে সে হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করবে।' হত্যাকারী রশিদের মৃত্যুদণ্ডের পর দেওবন্দের বিখ্যাত ধর্মীয় কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা রশিদের ইসলামিক কর্তব্য পালনের 'কৃতিত্বের' জন্য তাকে 'আলা ই-ইল্লীয়ীন' বা সপ্তম স্বর্গ শীর্ষে স্থান প্রদানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সম্পূর্ণ কোরান পাঠ করেন এবং প্রতিদিন সওয়া লাখ কোরানের আয়াত পাঠের পরিকল্পনা করেন।

দক্ষিণে কেরালা থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধ প্রদেশ, নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স, পঞ্জাব, বাঙ্গলার পূর্ব-পশ্চিম উভয় অংশে জেহাদি আক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। স্বভাবতই বিরক্ত ড. আম্বেদকর তাঁর বইয়ে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'Congress has failed to realize is that there is a difference between appeasement and settlement and that the difference is an essential one. Appeasement means buying of the aggressor by conniving at his acts of murder, rape, arson and loot against innocent persons who happen for the moment to be the victims of his displeasure.'

১৯২১ সালে কেরালার মালাবার অঞ্চলে মোপলাদের আক্রমণ ছিল মুসলমানদের প্রথম বড়ো আকারে সংগঠিত জেহাদ। মার্কিন নিবাসী ডাচ গ্রন্থকার ও মিশনারি জে.জে. বানিঙ্গা তাঁর 'দ্য মোপলা রেবেলিয়ন অব ১৯২১' বইতে লিখেছেন, গণহত্যার ব্যাপকতা এমনই ছিল যে পানীয় জলের কুয়ো ভরে যায় হিন্দুদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহে। তাঁদের গর্ভবতী মহিলাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ভ্রূণ বের করে ফেলা হয়। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করা হয়, তাদের বাবার সবার সামনেই জীবন্ত পোড়ানো হয়। হিন্দুদের চামড়া উপড়ে নেওয়া হয়, তাঁদের নিজেদের দিয়েই নিজেদের কবর খোঁড়ানো হয়। মহিলাদের প্রকাশ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করা হয়। শতাধিক মন্দির ধ্বংস করে বিগ্রহের গলায় গোমাংস জড়িয়ে দেওয়া হয়। অ্যানি বেসান্ত 'দ্য ফিউচার অব ইন্ডিয়ান পলিটিক্স' গ্রন্থে লেখেন, 'They established the Khilafat Raj, crowned a King, murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not apostatise. Somewhere about a lakh people were driven from their homes with nothing but the clothes they had on, stripped of everything.' স্বাভাবিকভাবেই এলাকার জনবিন্যাসে ঘটে যায় ব্যাপক পরিবর্তন।

মার্কিন ঐতিহাসিক এফ. রবিনসনের 'ইসলাম অ্যান্ড মুসলিম হিস্ট্রি ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া' বইটির তথ্য অনুযায়ী কেরালায় ১০ হাজার হিন্দু প্রাণ হারান। 'সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া' নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, ২০ হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরণের তথ্য। সমস্ত দক্ষিণ ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ সন্ত্রাসের আবহে খিলাফত নেতারা একটি প্রস্তাব পাশ করে যাতে লেখা ছিল, 'congratulations to the Moplas on the brave fight they were conducting for the sake of religion'। একই পথে হেঁটে এই হিন্দু গণহত্যা সম্বন্ধে গান্ধীজী মন্তব্য করেন, 'brave God-fearing Moplas who were fighting for what they consider as religion and in a manner which they consider as religious.' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে মাত্র তিনটি বলপূর্বক ধর্মান্তরণের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা সমগ্র ঘটনাটিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেয়। এই গণহত্যার নায়ক তথা খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক আলি মুসলিয়ারকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা দেওয়া হতো।

১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত নিয়মিত হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯২২-২৭ এই সময়কালে বাঙ্গলার ৩৫ হাজার মহিলা অপহৃত হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৬ সালে, যা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে কুখ্যাত। ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া এই আক্রমণ কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে নয়, হয়েছিল খাস কলকাতার বুকেই। মুসলমানদের দাবি মেনে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান গঠনের প্রশ্নে বাধ্য করার কৌশলের অংশ হিসেবে জিন্না ১৬ আগস্ট, রমজানের ১৮তম দিনে হজরত মহম্মদের বদর যুদ্ধে মক্কা দখল করার দিনেই এই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে'র ডাক দেন। ২৯ জুলাই বম্বেতে মুসলিম লিগ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে'র প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রসঙ্গে জিন্নার মন্তব্য ছিল, 'now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action. I am not prepared to discuss ethics. We have a pistol and are in a position to use it.' এর কারণ দেশের হিন্দু নেতৃত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের থেকে কোনোভাবেই দেশভাগের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছিল না। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঘটনার পর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ফ্লোরে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, You say you will plunge the country into civil war if you do not get Pakistan and we say you shall not get Pakistan by any means whatsoever.'

কাজেই এই ঘটনা সংঘটিত করার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল মুসলমানদের

তরফে। ঘটনার প্রাক্কালে হিন্দু মহাসভা সকলকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম বজায় রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। অপরদিকে মুসলমান নেতৃত্বের তরফে ছিল হিংসার জন্য চরম প্ররোচনা। কলকাতার মেয়র এস.এম. উসমানের তরফে জেলা মুসলিম লিগের প্রচারপত্রে বলা হয় 'brethern of Islam, let it be remembered that in this holy month of Ramadan, the Holy Koran revealed itself, and Ummat Mohammed appeared as the Prophet. In this month the Kafirs were annihilated...'

অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী তথা আইন-শৃঙ্খলা মন্ত্রী এবং কট্টরবাদী নেতা হলেন সুরাবর্দি ছিলেন এই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রধান রূপকার। ৫ আগস্ট দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'Bloodshed and disorder are not necessary evil in themselves, if resorted to noble cause. Among Muslims today, no cause is dearer or nobler than Pakistan.' তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কোটা থেকে ১০০ গ্যালন পেট্রোলের কুপন ইস্যু করেন। ঘটনার আগে কলকাতার প্রায় সব থানায় মুসলমান আধিকারিক পোস্টিং থেকে ঘটনার দিনগুলোতে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখা সরাসরি তাঁর নির্দেশেই ঘটে। বিভিন্ন দেশি অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক মজুত করা হয় শহর জুড়ে। মেয়র উসমান ওইদিন মুসলিম লিগের ডাকা হরতালে ১০ লক্ষ মুসলমানকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুম্মার নমাজের পর শুরু হয় হিন্দুহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও হিন্দু মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। সঙ্গে বলপূর্বক ধর্মান্তরণ।

এই ঘটনার অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সিংহ ও অশোক দাশগুপ্ত রচিত '১৯৪৬ দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস অ্যান্ড নোয়াখালি জেনোসাইডস' বইটিতে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ রয়েছে। ঘটনায় মৃতের প্রকৃত সংখ্যা ১৫ হাজার পেরিয়ে গিয়েছিল (দ্য স্টেটসম্যান, ২২ আগস্ট ১৯৪৬)। রাস্তা থেকে ৫৮৬৯টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। (পি. এস মাথুর, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পত্রিকা, ১৬.০৮.১৯৭৩)। ধাপার মাঠে ৩১৭৩টি দেহ সৎকার হয়। অবশিষ্ট দেহ ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা, খাল, বিল ও গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয়। আহতের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাইফ ম্যাগাজিন, ইউ.এস.এ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)। ৯০০ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটে, ২৫০০ দোকান ও বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত ও লুঠ হয়। প্রাণহানি থেকে শুরু করে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির সিংহভাগই হয় হিন্দুদের। গৃহহীন হয়ে পড়েন ১ লক্ষের ওপর মানুষ। শহর ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালানো হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে হাওড়া স্টেশনে, হুগলী নদীর জেটিঘাটে।

যদিও মুসলমানদের তরফ থেকে একে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু একজন ইউরোপীয়কেও তাঁরা আঘাত করেনি। অক্ষত ছিল সবকটি ইউরোপীয় দোকান। প্রত্যাশিতভাবেই বাঙ্গলার তৎকালীন গভর্নর ফ্রেডরিক বারোজ ছিলেন মুসলিম লিগের পক্ষে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য, সেই সময়ে কলকাতার ৭৩ শতাংশ মানুষ ছিলেন হিন্দু, মাত্র ২৩ শতাংশ মুসলমান। তা সত্ত্বেও হিন্দুরাই আক্রান্ত হন এবং এত বিপুল সংখ্যায় প্রাণ হারান। তিনদিন পর যখন তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিরোধ করতে শুরু করেন, মুসলমানদের রক্ষার উদ্দেশ্যে বারোজ কলকাতায় সেনাবাহিনী নামান। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বুদবুদ নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে দিয়েছিল এই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। ব্রিটিশ সাংবাদিক, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার লিওনার্ড মোজলের বর্ণনায় 'Between dawn of the morning of 16th August 1946 and dusk three days latter, the people of Calcutta hacked, battered, burned, stabbed or shot 6,000... and raped and maimed 10,000...turned Calcutta into a charnel house... the corpses of men, women and children lay stinking in the gutters of Chowringhee Square unroll the only reliable garbage collectors of India, the vultures, picked them clean; and with every mouthful they picked away the fabric of unitary India...'

এই সময়কালে ভারতে যে বিরাট সংখ্যক আক্রমণ হয় তার মধ্যে জনবিন্যাসগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৪৬-৪৭ সালে নোয়াখালি- ত্রিপুরার হিন্দু গণহত্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাকেশ বটব্যালের 'কমিউনালিজম ইন বেঙ্গল ফ্রম ফেমাই টু নোয়াখালি, ১৯৪৩-৪৭' বইটি থেকে জানা যায় এই বিরাট হত্যালীলার মূল কারণ ছিল সৌদি ওয়াহাবি আন্দোলন নামক অতি চরমপন্থী ইসলামিক মতবাদ এবং এর সঙ্গে যুক্ত অঞ্জুমন সোসাইটি। সুরাবর্দি এই সময় সরকারি ব্যয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বিহারি মুসলমান এনে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেন (আইনসভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বক্তৃতা, প্রসঙ্গ নোয়াখালি ও চাঁদপুর দাঙ্গা)। নোয়াখালি থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে কুমিল্লায়। বাংলাদেশের সুফি পির মৌলবি গোলাম সারওয়ার ছিলেন এই ভয়াবহ গণহত্যার পুরোধা। প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্ট, বিচারপতি ও নেতাজী কমিশনের চেয়ারম্যান গোপাল দাস খোসলার গ্রন্থ 'স্টার্ন রেকনিং' অনুযায়ী নোয়াখালিতে বসবাসকারী ৪ লক্ষ হিন্দুর অন্তত ৯৫ শতাংশ-কে মৃত্যুর মুখে দাঁড় করিয়ে ইসলাম কবুল করানো হয় অথবা হত্যা করা হয়। খোসলার বয়ানে, 'The converted persons were made to read kalma, slaughter cows and eat their flesh'। নিহত হন ৫ হাজার মানুষ। ৭০-৮০ শতাংশ অমুসলমানদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা হয়। সেই মধ্যযুগের সময় থেকেই একের পর এক গণহত্যা, ধর্মান্তর ও অত্যাচারে নিজভূমে পরবাসী হয়ে পড়া বাঙ্গালি হিন্দুদের জনবিন্যাস আমূল পালটে দিয়েছিল ইসলামিক কট্টরবাদ। দীনেশচন্দ্র সিংহ ও অশোক দাশগুপ্ত তাঁদের বইয়ে লিখেছেন, 'We the Hindus of Bengal happen to be one of the worst vic-

tims of Islamic intolerance in the world, which had been under Islamic attack for centuries, beginning with the invasion of the Turkish marauder Bakhtiyar Khilji eight hundred years back'।

১৯৪৭ সালে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে পাকিস্তান গঠনের সময় পর্যন্ত প্রস্তাবিত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আক্রমণ হয় পাকিস্তান সরকারের প্রশ্রয় বা সরাসরি মদতে। তৎকালীন লাহোর শিখ ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকাল রিসার্চের সদস্য, পদ্মভূষণ গুরবচন সিংহ তালিবের 'মুসলিম লিগ অ্যাটাক অন শিখস অ্যান্ড হিন্দুজ ইন পঞ্জাব ১৯৪৭' বইটিতে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। তা থেকে জানা যায়, মুসলমানের হাতে পঞ্জাব ও অন্যান্য পাকিস্তানি প্রদেশে বিনা প্ররোচনায় ৫৯২টি বড়ো আক্রমণের ঘটনা ঘটে। তালিব লিখেছেন, 'police and military—which, by now, were entirely composed of Muslims on the Pakistan side, due to the partition of personnel and assets between India and Pakistan— gave not only active assistance and encouragement to the rampaging Muslim mobs, but oftentimes led them, directed their operations, and finished off the job of murder where the mobs could not succeed single-handed. By August, the non-Muslim population of Lahore had been reduced to only a fraction of their former numbers.'

এত অত্যাচার সত্ত্বেও জন্মস্থানের টানে লাহোরে পড়ে থাকা অবশিষ্ট হিন্দু ও শিখদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল বীভৎস্য গণহত্যা। তার বিবরণ দিতে গিয়ে তালিব লিখছেন, 'the destruction, devastation and massacre soon rained on the Hindus and Sikhs and nine thousand of their corpses were left to rot on the streets of Lahore causing a terrible stench.' ১০ আগস্ট নাগাদ সমস্ত শিখ ও হিন্দু এলাকা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুস্তান টাইমস তাদের সংবাদে লেখে, 'Seventy per cent of the casualties of the last three weeks in West Punjab were inflected by the communally maddened troops and policement. The victims of their bullets numbered thousands. The massacre at Sheikhupura, which was their handiwork, puts into shade the slaughter at Jalianwala Bagh.'

চূড়ান্ত নৈরাজ্যের কারণে এইসব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও আনুমানিক হিসেব আছে। 'এবিষয়ে নিত্যরঞ্জন দাসের 'মুসলমান শাসনে ভারতবর্ষ' বইটির তথ্য অনুযায়ী মুসলমান আক্রমণে নিহত হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৫-৩০ লক্ষ। এম.এ. খানের বক্তব্য অনুযায়ী, 'in the course of the Partition, estimated 600,000 to two million people died; abut a hundred thousand predominantly Hindu and Sikh women were raped.' বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তান ত্যাগ করেন ৪৭ লক্ষ থেকে দেড় কোটি হিন্দু ও শিখ। লিওনার্ড মোজলের বর্ণনায় যা ছিল মানব ইতিহাসের বৃহত্তম অভিবাসন। 'লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ' বইটিতে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'one convoy of Sikhs and Hindus from West Punjab was 74 miles long...'আকাশপথে দেখা সে যাত্রার আরেক ঝলক ফুটে ওঠে ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক ল্যাপিয়ের রচিত 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা এক পাইলটের অভিজ্ঞতায়, 'Another (pilot) remember flying over fifteen breathtaking minutes at 200 m.p.h without reaching the end if the column.'

দেশভাগের সময়ে বহু লক্ষ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়। ১ লক্ষ হিন্দু ও শিখ মহিলা অত্যাচারিত হয়ে যৌনদাসীতে পরিণত হন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়া ৭৫,০০০ হিন্দু নারীকে ভারতে নিয়ে আসা হয়। মোজলে'র গ্রন্থ অনুযায়ী উভয় দেশ মিলিয়ে ৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং ১ লক্ষ মহিলার অপহরণের তথ্য পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসেন ১০ লক্ষ হিন্দু। ১৯৫০ সালের পর আসেন আরও ১ কোটি। এই দেশভাগ ছিল আসলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক মুসলমান দেশ গঠনের অন্ধ বাসনার ফলশ্রুতি। এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম ব্যাপক জনবিন্যাসগত যে পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ভয়াবহতার আভাসও আমরা পেয়েছি। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এই সবকিছুর কেন্দ্রেও ছিল সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাকামী ধর্মীয় কট্টরপন্থা। স্বাধীনতার পরেও ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে হয়েছে যার জনবিন্যাসগত গুরুত্ব আছে। যেমন, ১৯৮৩-তে অসমের নেলিতে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। ১৯৮৪-তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর শিখ-বিরোধী গণহত্যায় পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বহু শিখকে হত্যা করা হয়। সরকারি মতে নিহত শিখের সংখ্যা ৩৫০০ হলেও বেসরকারি হিসেবে তা ১৭ হাজার। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের বুকেও বেশ কিছু জেহাদি আক্রমণ ঘটেছে যা স্থানীয় জনবিন্যাস পরিবর্তনের ফল হিসেবে মনে করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-এ ২০১৩ সালে ২০০ হিন্দুঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০১৬-তে মালদার কালিয়াচকে ১ লক্ষ মুসলমান পুলিশ থানা জ্বালিয়ে দেয়। ওই বছরই হাওড়ার ধুলাগড়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আক্রমণ। ২০১৭ সালে উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে চলা আক্রমণ এবং ২০১৯-এ ওই জেলার সন্দেশখালির আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি কতখানি ভয়াবহ হতে পারে তা প্রত্যক্ষ করেছে কাশ্মীর। বর্তমানে প্রত্যক্ষ করছে মণিপুর। জনবিন্যাসের এমনই দ্রুত পরিবর্তনে একেবারে ওপরের দিকে থাকা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। □

ফুল চাষে কোটি টাকা উপার্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রথাগত ধ্যানধারণা বহির্ভূতভাবে কৃষিকে জীবিকা করেও জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব। ১৯৭৮ সালে লুধিয়ানায় অবস্থিত পাঞ্জাব এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাশ করার পর কিছুদিন হিরো ফাইবারস্ লিমিটেড কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে চাকরি করেছিলেন। এরপর লুধিয়ানা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে ল্যান্ডস্কেপ অফিসার পদে যোগ দেন। কিন্তু ফুলচাষের মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়, কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষায় অধীত বিদ্যার সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে অবতার সিংহ ধিন্দসা ১৯৮৫ সালে পাঞ্জাবের পাতিয়ালাতে প্রথম ফ্লোরিকালচার ফার্ম বা ফুলচাষ কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারত থেকে ১৫০টি দেশে ফুল রপ্তানি হয়ে থাকে। যদিও উদ্যান ফসল ফুল ও ফলের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে ভারতের অংশীদারিত্ব ১ শতাংশেরও কম। পচনশীল পণ্য হওয়ার কারণে ফুল তোলার পর ফুলকে তাজা রাখাটা একটা চ্যালেঞ্জ। ফুল তোলার পর ফুলকে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্যাকেটজাত ফুল ৭ - ৮ দিন তাজা থাকে। ফুল সংরক্ষণের বিকল্প রূপে বিভিন্ন ফুলের বীজ তৈরি করে অবতার সিংহ রপ্তানি শুরু করলেন এবং এক নতুন কৃষি বাণিজ্যের জন্ম দিলেন। ১৯৮৫ সালে তাঁর কৃষি খামারের কাজ শুরু হওয়ার পর দ্রুতগতিতে এই ফুল ও ফুলের বীজ রপ্তানি বাণিজ্যের পরিধি বেড়েছে। বর্তমানে পঞ্জাবের ফুলচাষিরা প্রতি বছর ১০০-১৫০ টন ফুলের বীজ রপ্তানি করে ৫-৬ কোটি টাকা পর্যন্ত অর্থ উপার্জন করেন।

অবতার সিংহ জানান , সাড়ে তিন একর জমিতে প্রথম উৎপাদন শুরু হওয়ার পর আজ দেড় হাজার একর জমিতে ফুলের বীজ উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলছে। ২৫০০ চাষি প্রত্যক্ষভাবে এই চাষের সঙ্গে যুক্ত। সব মিলিয়ে প্রায় ৩-৪ হাজার লোক আজ অবতার সিংহের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন প্রজাতির পাঁচশোরও বেশি ফুলের বীজ উৎপাদিত হয়। একজন কৃষিবিজ্ঞানী অধ্যাপকের বিশেষ অনুপ্রেরণায় অবতার সিংহ উৎপাদিত ফুলের বীজ ইওরোপে রপ্তানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই রপ্তানি বাণিজ্যের বিকাশের মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের বৃদ্ধিতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ যোগদানের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। অবতার সিংজীর এই প্রতিষ্ঠান আমেরিকা, জাপান, ইওরোপের বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে বিশ্বের ২৫টিরও বেশি দেশে ফুলের বীজ রপ্তানি করে ভারতের বৃহত্তম ফুলের বীজ রপ্তানিকারক সংস্থায় পরিণত হয়েছে ও ফুলের বীজের বিশ্ব মানচিত্রে আজ পাঞ্জাবকে স্থান করে দিয়েছে। ফুল চাষ ও ফুলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও হয়ে উঠেছেন অবতার সিংহদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এইভাবে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি যোজনাসমূহকে বাস্তবের মাটিতে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ১৯৯৪ সালের পর থেকে তিনি বিভিন্ন শাক-সব্জীর বীজ উৎপাদনের প্রক্রিয়াও শুরু করে দেন। প্রতি বছর নির্দিষ্ট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৫০০ - ৩০০০ একর জমিতে বিভিন্ন সব্জীর বীজ উৎপাদিত হয়। পাঞ্জাবের বাইরে হিমাচল প্রদেশ, জম্মু - কাশ্মীর, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও কর্ণাটকে আজ তাঁর বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। একটু অন্যরকম ভাবনাচিন্তার প্রয়াস ঘটিয়ে এইভাবে অনেক ব্যক্তিই বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। সব ধরণের কাজে ১০০ শতাংশ প্রচেষ্টাই আরও বেশি সংখ্যায় কর্মসংস্থানের উৎসমুখ খুলতে পারে। এই উচ্চাশা থাকলে ও গতানুগতিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলে চাকরি করার বদলে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরতা অর্জন সম্ভব বলে অবতার সিংহ মতপ্রকাশ করেন।

উকুন ও ছারপোকা

একটা খুদে উকুনি। নাম তার মন্দবিসর্পিণী। গুট গুটি পায়ে চলে বেড়াত। তাই তার এমন নাম। রাজার তুলতুলে নরম বিছানার চাদরের তলায় সে লুকিয়ে থাকত।

রাজার মিষ্টি রক্তের স্বাদ গ্রহণ করে পরম সুখেই তার দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন সেখানে হাজির হলো এক

ছারপোকা। নাম তার অগ্নিমুখ। নতুন আগন্তুকটিকে দেখে উকুনি সাবধান করে দিয়ে বলল, তোমার কি মরার শখ হয়েছে? প্রাণে বাঁচতে চাও তো এখান থেকে পালাও।

অগ্নিমুখ বলল— দিদিঠাকরুন, অতিথিকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ো না। অভুক্তকে খেতে দেওয়াই হলো ধর্ম। তোমার কি ধর্মের ভয় নেই? রাজামশাই কত ভালো ভালো খাবার খান। তার রক্তের স্বাদই আলাদা। আমাকে একটু সুযোগ দিলে জিভের লালসা মিটিয়ে নিতাম।

ছারপোকার কথা শুনে উকুনি আরও বিরক্ত হলো। বলল— চেনা নাই, জানা নেই, এমন কাউকে তো আমার ঘরে ঠাঁই দিতে পারি না। তাছাড়া গতরটা তো ভালোই বানিয়েছ। এই একটুখানি জায়গাতে তুমি ধরবে না। কত জায়গায় তুমি ঘুরে বেড়াও। তোমার জিভের সুখ করার ঢের জায়গা আছে।

— কথাটা ঠিক। অগ্নিমুখ বলতে থাকল। অনেক রকমের রক্তের সোয়াদ আমি পেয়েছি। ঝাল, নোনতা, তেতো, বিদঘুটে নানা ধরনের। ওসব ছাইপাঁশ খাওয়া রক্ত। আজেবাজে জিনিস খায় ওরা। কিন্তু রাজামশাই, তিনি কত ভালো ভালো খাবার খান। তাঁর রক্তের স্বাদই আলাদা, মিঠে। আমি এ স্বাদ কখনোও পাইনি।

অগ্নিমুখের কথাগুলি উকুনির মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। সে চোখ পিটপিট করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছারপোকাকে লক্ষ্য করল। তারপর বলল— শোনো হে পোড়ারমুখো, অতিথিকে তাড়ানো আমার ধর্ম নয়। তবে একটা কথা মনে রেখো, বেশি হাভাতেপনা করো না, তাহলেই বিপদ। রাজামশাই ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ধীর স্থির হয়ে থাকতে হবে। ছটফটানি স্বভাব দেখানো চলবে না। যদি আমার শর্তে রাজি হও, তাহলে মহারাজার মিঠে রক্ত চুষে খেতে পারবে।

ছারপোকা বলল— হ্যাঁ গো দিদিঠাকরুন, তোমার কথামতোই চলব। যেমনটি বলবে, তেমনটি করব।

মহারাজা পালঙ্কের বিছানার গদির নীচে বসে দুই রক্তচোষ্য প্রাণী তখন এসব কথাই বলে চলেছে।

খানিক বাদে রাজামশাই ঘরে এসে ঢুকলেন। বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। মহারাজার গায়ের গন্ধ নাকে যেতে ছারপোকা চঞ্চল হয়ে উঠল। তার যেন আর তর সইছে না। মন্দবিসর্পিণীর উপদেশ সব ভুলে গেল। ছুটে গিয়ে মহারাজের পিঠে ফুটিয়ে দিল হুল।

মহারাজের চোখে তখন সবে তন্দ্রা নেমেছে। হঠাৎ পিঠে একটা দংশন জ্বালা অনুভব করে লাফিয়ে উঠে বসলেন।

বাপরে কী জ্বালা। মনে হচ্চে সুঁচের ডগা কে যেন বিঁধিয়ে দিয়েছে —তিনি পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে চাকরদের নাম ধরে ডেকে উঠলেন।

মুহূর্তের মধ্যে সকলে অস্থির পায়ে ছুটে এল — কী হয়েছে, হলো কী?

মহারাজা বললেন, বিছানাটা ভালো করে দেখো। সবকিছু উলটে পালটে দেখো। নিশ্চয় ছারপোকা বা উকুনে বাসা করেছে।

সবাই ব্যস্ত হয়ে কাজে হাত লাগাল। বিছানা উলটেপালঠে, খুঁজতে লাগল।

অগ্নিমুখ বিপদের গন্ধ পেয়ে আগেই কাঠের ফাঁকে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। আর বেচারা মন্দবিসর্পিণী সে তো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না। গুটি গুটি পায়ে চাদরের সেলাইয়ের ভাঁজের মধ্যে নিজের খুদে দেহটাকে আড়াল করল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। রাজার দাস-দাসীরা তাকে খুঁজে বের করল। নখের ওপর রেখে নখ দিয়ে পিষে মেরে ফেলল।

ছোট্ট বন্ধুরা, তাই বলা হয় অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে বা তাকে আশ্রয় দিলে নিজেকেই বিপদে পড়তে হয়।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

বাবুরাও শেডমাকে

গোণ্ড জনজাতির এই স্বাধীনতা সংগ্রামী ১৮৩৩ সালের ১২ মার্চ মহারাষ্ট্র চন্দ্রপুরের গেটাগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে চন্দ্রপুরে ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত হয়। ১৮৫৭ সালে গোণ্ড যোদ্ধাদের সংগঠিত করে বিশেষ রণসেনা গড়ে তোলেন। ১৮৫৮ সালের ৭ মার্চ এদের সাহায্যে তিনি রাজগড়কে ব্রিটিশ মুক্ত করেন। ২০ মার্চ আবার ইংরেজদের পরাজিত করেন। এই বছরই ২৯ এপ্রিল চিচগুকী সেনা ছাউনিতে হামলার সময় তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। ২১ অক্টোবর ইংরেজ সেনা তাঁকে একটি অশ্বত্থগাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রতি বছর ২১ অক্টোবর এলাকার মানুষ এই স্থানে একত্রিত হয়ে তাঁর অমর আত্মার প্রতিশ্রদ্ধ াঞ্জলি অর্পণ করেন।

জানো কি?

- আইসল্যান্ড বিশ্বের একমাত্র দেশ যাদের সেনাবাহিনী নেই
- ভারতের মধ্যপ্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ বনাঞ্চল রয়েছে (৭৭৫২২ বর্গ কিমি)।
- ভারতের গান্ধীনগর রেলস্টেশনটি শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত।।
- চারটি একই সংখ্যাকে একসঙ্গে ইংরেজিতে কোয়াড্রুপল বলা হয়।
- পাঁচটি বাহুবিশিষ্ট আকৃতিকে পেন্টাগন বলা হয়।
- কঠিনতম পদার্থ হলো হিরে।
- একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৩২টি দাঁত থাকে।

ভালো কথা

এবার রথের দিন বিকেলে ছোটো রথটিকে পুজো করে আমরা ভাই-বোনেরা রাস্তায় নিয়ে নামলাম। পাশের বাড়ির তনু, শিউলি, সোনু, রামু এসে তাতে যোগ দিল। রাস্তায় কত লোক আমাদের রথের দড়ি একটু টেনে প্রণাম করে পয়সা দিল। দেড় ঘণ্টা ঘুরে সবাই আমাদের বাড়িতে এলাম। তারপর গুনে দেখি, ১৫০ টাকা। রাস্তায় কয়েকজন ভিখিরিকে ১০০ টাকা দিয়ে ৫০ টাকার জিলিপি আর পাঁপড়ভাজা নিয়ে এলাম। সবাই মিলে খেলাম।

তুহিনা দাস , ষষ্ঠ শ্রেণী, নিউ গড়িয়া, কলকাতা-৯৪।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ইচ্ছে

নবনীতা সরকার, নবম শ্রেণী, টাউন হল পাড়া, বর্ধমান।

ইচ্ছে করে উড়ে যেতে
দূর হতে বহুদূরে
পাখির মতো ডানা মেলে
বেড়াই শুধু ঘুরে।
ইচ্ছে করে উড়ে যেতে
মানস সরোবরে
বরফজলে চানটি সেরে
আবার আসি ফিরে।

ইচ্ছে করে উড়ে যাই
আমার ইস্কুলেতে
ছুটি হলেই উড়ে উড়ে
বাড়ি আসি ফিরে।
সারাদিন উড়ে উড়ে
ক্লান্ত হয়ে শেষে
ছুটে এসে মায়ের কোলে
পড়বো হেসে হেসে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

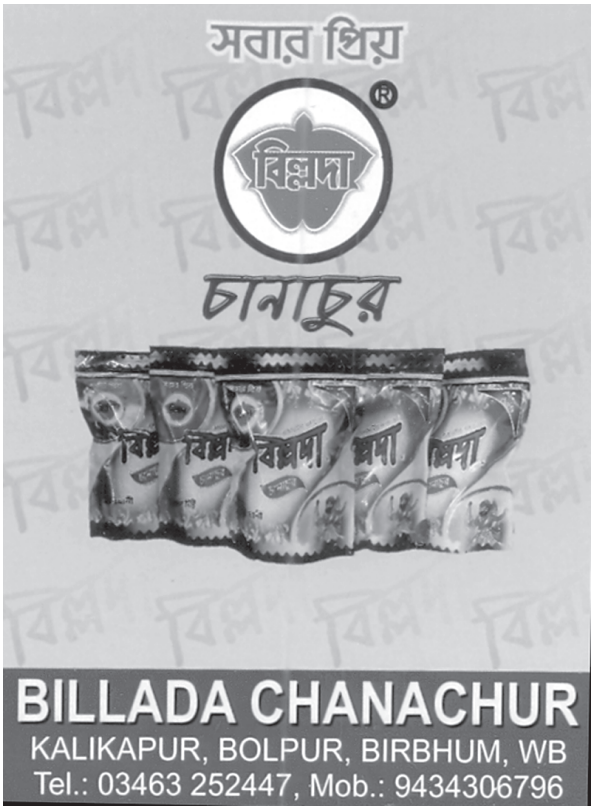

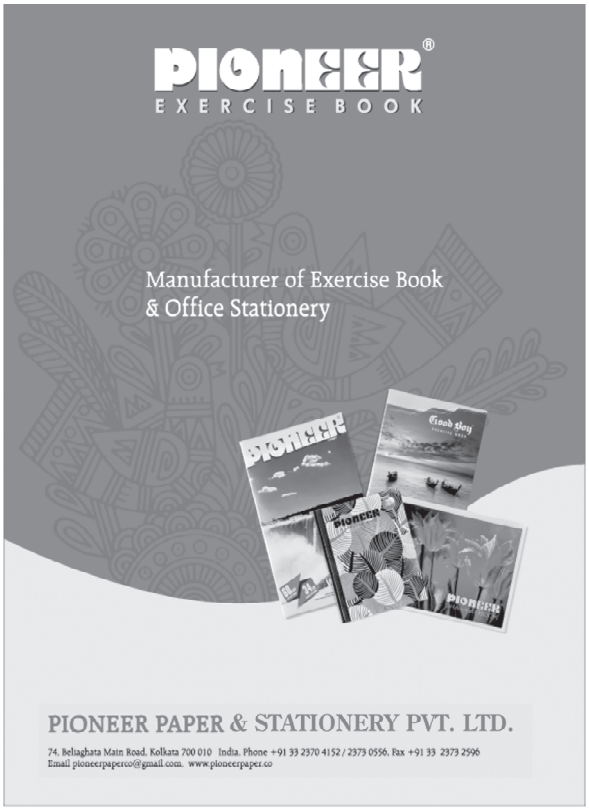

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

গত দেড়শো বছরে জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হয়ে এপারে এসে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন

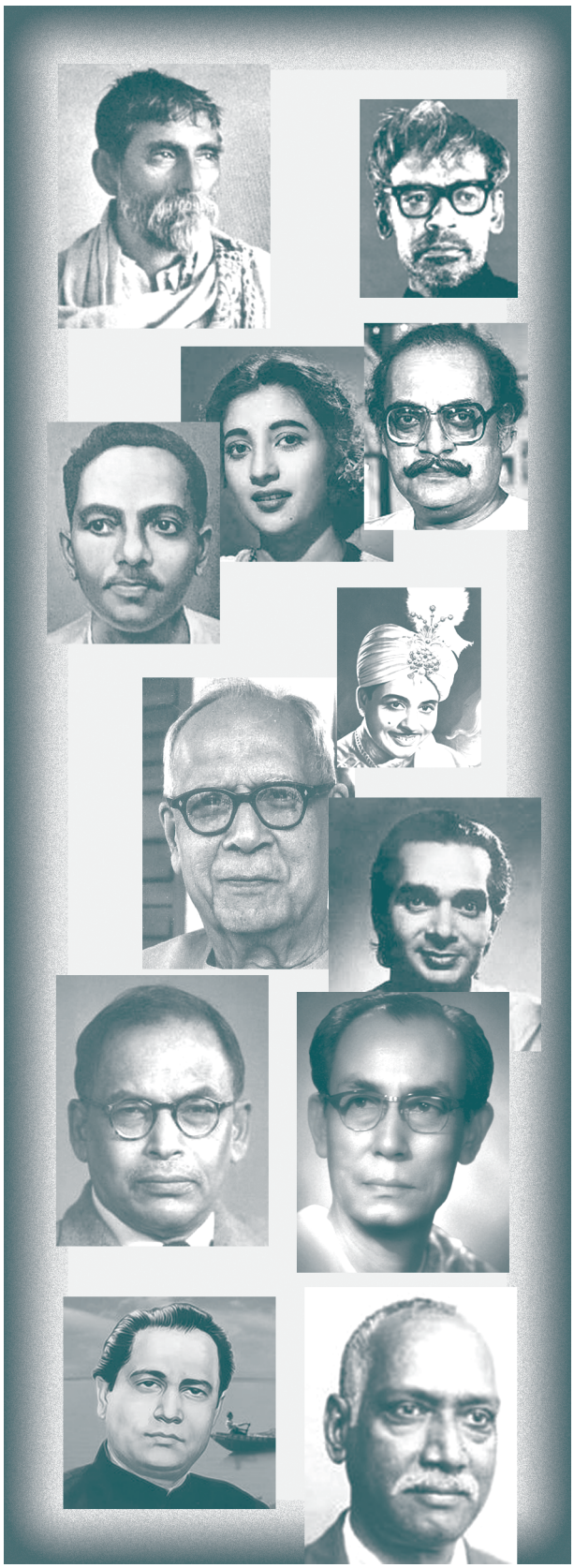

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

একসময়ে এ অঞ্চল ব্রিটিশ শূন্য হলো ঠিকই। দেশও ভাগ হলো। জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান নামের এক অভিশপ্ত ভূখণ্ডের। জায়গা করে নিল নব্য ধর্মান্ধ গোড়া কট্টরবাদী মুসলমান। শুরু হলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর নারকীয় তাণ্ডব। যত রকমের অন্যায় অত্যাচার আছে তা জারি থাকলই, সঙ্গে হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন, জমি দখল, হত্যা, ধর্মান্তরণ, নারীনির্যাতন। এতে হিন্দু অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। হাজার বছর ধরে যারা পাশাপাশি ভাই ও বন্ধুর মতো বাস করেছিল ক্রমে তারাই হয়ে গেল পরস্পরের শত্রু। ধর্মীয় ফতোয়া দিয়ে মোল্লা-মৌলবিরা জেহাদিদের উসকানি দিল। ফলে নির্যাতনের মাত্রা সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল। এরই মধ্যে দেশটিতে স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে উঠল। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে স্থানীয় রাজাকার বলে এক শ্রেণীর নরপিশাচরা আবার হিন্দুদেরই টার্গেট করে নিল। তারা চলমান প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করে গণহারে হিন্দু হত্যা শুরু করল। চূড়ান্ত ক্ষতির মুখে বিধ্বস্ত হলো হিন্দু। হিন্দুদের উপর অমানবিক নির্যাতন সে দেশের এখন মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে উঠেছে। যা এখনো চলমান বহাল তবিয়তে।

সম্প্রতি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনার অজুহাতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে কিংবা ভোটে জেতার আনন্দ বা ভোটে হারার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুদের ওপর বারবার হামলা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে তাদের বিতাড়িত করা, হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ, হত্যা, বিবাহে বাধ্য করা তাদের একমাত্র কাজে পরিণত হলো। দেখা গেল যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা পুরানো অভ্যাস বহাল করতে দ্বিধাবোধ করে না। অবশ্য এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। বরং হিন্দুদের শত্রু বানিয়ে ফেলে আসা সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' ঘোষণা করে আরেক ধাপ এগিয়ে রাখলো। নিরুপায় হয়ে সবকিছু ফেলে রেখে গেল অনিশ্চিত গন্তব্যে প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে ভারতে পালাতে বাধ্য হলো হিন্দুরা। অসভ্যতার চরম উৎকর্ষতার সুযোগে মুসলমান কুচক্রীরা মন্দিরে গোমাংস, দুর্গাদেবীর পায়ে কোরান রেখে দিয়ে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কলঙ্কজনক কৌশল এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে হিন্দুদের জন্য ওই ভূখণ্ড হয়ে উঠলো বসবাসের অযোগ্য।

ফঃ ৬

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে চলে আসা এই সমস্ত মানুষেরা ভারতে শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য, চিকিৎসা, আবিষ্কার, সেবা, ধর্ম-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য খ্যাতি অর্জন করে যাচ্ছেন। পূর্ব পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে ভারতে বসবাস করা কতিপয় কীর্তিমান মানুষের নাম উল্লেখ করা হলো।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তিনি হয়ে উঠলেন গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। বাঙ্গালি ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। তৎকালীন কুমিল্লা জেলার অধীনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার গোকর্ণঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামের একটিমাত্র উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় ও অমর প্রতিভা হিসেবে সবিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেন।

অর্মত্য সেন : তাঁর জন্ম শান্তিনিকেতনে মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের 'পর্ণকুটীরে'। তাঁদের আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মানিকগঞ্জে। দুর্ভিক্ষ, মানব উন্নয়ন তত্ত্ব, জনকল্যাণ অর্থনীতি ও গণদারিদ্রের অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিষয়ে গবেষণা এবং উদারনৈতিক রাজনীতিতে অবদান রাখার জন্য ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনৈতিক নোবেল স্মারক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ভারত এবং বিশ্বে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ নামক সংগঠনের প্রবর্তক। তিনি পাবনা জেলার হিমায়তপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাঙ্গালি হিন্দুদের প্রাণে প্রাণে তিনি গুরু হিসেবেই ভক্তিভরে বিরাজমান আছেন।

উৎপল দত্ত : তিনি হয়ে উঠলেন অভিনেতা ও নাট্যকার। তাঁর জন্ম বরিশালে। গণনাট্য আন্দোলন ছিল মূলত রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন। তিনি বাংলা মঞ্চনাটকে অভিনয়ের জন্য সকলের মন জয় করেছেন।

উদয়শঙ্কর : তিনি বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক। জন্ম কালিয়া গ্রাম, যশোহর। উদয়শঙ্করের আকর্ষণীয় অভিনয়কলা দক্ষিণ এশিয়ার ধ্রুপদী লোকনৃত্য ও সংগীতের সমৃদ্ধি সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে এক নতুন ধারণার জন্ম দেয়। ১৯৩৭ সালে কলকাতায় উদয়শঙ্করকে প্রদান করা হয় এক বীরোচিত সংবর্ধনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

ঋত্বিক ঘটক : তিনি হলেন চলচ্চিত্র পরিচালক। তাঁর জন্ম ঢাকা শহরের ঋষিকেশ দাস লেনে। বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে তিনি সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেনের সঙ্গে তুলনীয়।

কালিকারঞ্জন কানুনগো : তিনি ছিলেন ইতিহাসবেত্তা। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বোয়ালখালি উপজেলার কানুনগোপাড়া গ্রামের এক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রফেসর কানুনগোর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ছিল উপমহাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস। মুসলমান শাসক, রাজপুত এবং মারাঠাদের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৯৭২ সালের ২৯ এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ের নিজস্ব বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়।

কুসুমকুমারী দাশ : তিনি একজন বাঙ্গালি মহিলা কবি। জন্ম ১৮৭৫; বরিশাল। পিতা-মাতা চন্দ্রনাথ দাশ ও ধনমানী দাশ। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের মা তিনি। তিনি খুব বেশি লিখে যাননি কিন্তু যেটুকু রেখে গেছেন তাতে তার প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। ১৯৪৮ সালে কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাড়িতে তার মৃত্যু হয়।

গীতা দত্ত : তিনি ছিলেন সংগীতশিল্পী। একটি ধনী জমিদার পরিবারে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে হিন্দি ছবিতে নেপথ্য সংগীত এবং বাংলা আধুনিক গান গাওয়ার জন্য বিখ্যাত।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য : তিনি ছিলেন পতঙ্গ বিশারদ এবং উদ্ভিদবিদ। জন্ম বৃহত্তর ফরিদপুরের শরীয়তপুর জেলার লোনসিং গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে। পিঁপড়ে, মাকড়সা, চামচিকা, টিকটিকি, আরশোলা, কাঁকড়াবিছা, শুঁয়াপোকা, ব্যাঙাচি, প্রজাপতি ইত্যাদি প্রাণীর জীবনপ্রণালী ও স্বভাব-চরিত্র বিষয়ক তাঁর পর্যবেক্ষণ ও লিখিত নিবন্ধগুলি দেশ ও বিদেশে মৌলিক গবেষণা বিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর অবদান অতুলনীয়।

গোপাল হালদার : তিনি একজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ। তাঁর জন্ম ১৯০২ সালে ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদগাঁও গ্রামে। শৈশব কেটেছে গহন মফস্সল নোয়াখালি শহরে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ গোপাল হালদার বিশেষভাবে পরিচিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ, বামপন্থী চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক হিসেবে।

জগদীশ গুপ্ত : তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক এবং ছোটোগল্পকার। তাঁর পৈতৃকনিবাস ফরিদপুর জেলার খোর্দ মেঘচারমি গ্রামে। পিতার কর্মসূত্রে জগদীশ গুপ্ত কুষ্টিয়া জেলার আমলাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বাঙ্গালি।

জীবনানন্দ দাশ : তিনি একজন আধুনিক কবি। তিনি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা বাঙ্গলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার নিবাসী ছিলেন। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ জীবনানন্দের কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। তাতে তিনি 'রূপসী বাংলার কবি' অভিধায় খ্যাত হয়েছেন।

তারাপদ চক্রবর্তী : তিনি কণ্ঠশিল্পী ও সংগীতাচার্য ছিলেন। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় এক সংগীতশিল্পী-পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ তিন পুরুষ ছিলেন সংগীতজ্ঞ। তিনি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হন। সংগীতাচার্য, সংগীতার্ণব, সংগীতরত্নাকর। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করে। ব্যক্তিগত কারণে তিনি খেতাব গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন।

তুলসী লাহিড়ী : তিনি একজন নাট্যকার, অভিনেতা, সুরকার। তাঁর জন্ম বর্তমান গাইবান্ধা জেলার দাদুল্লাপুর উপজেলার নলডাঙ্গা গ্রামে। নাটক রচনা ও অভিনয় দিয়ে নাট্য আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার : তিনি ছিলেন রূপকথার প্রখ্যাত রচয়িতা এবং সংগ্রাহক। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় উলাইল এলাকার কর্ণপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত 'ঠাকুরমার ঝুলি' শীর্ষক অবিস্মরণীয় গ্রন্থের জন্য বাঙ্গালি পাঠকসমাজে তিনি সমধিক পরিচিত। লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহক ছড়াকার, চিত্রশিল্পী, দারুশিল্পী এবং কিশোর কথাকার হিসেবেও দক্ষিণারঞ্জন বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

দেবব্রত বিশ্বাস : তিনি একজন

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে। এক স্বনামধন্য ভারতীয় বাঙ্গালি রবীন্দ্রসংগীত গায়ক ও শিক্ষক। পিতামহ কালীমোহন বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে নিজগ্রাম ইটনা থেকে বিতাড়িত হন।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী : তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী। রংপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেবীপ্রসাদ অসংখ্য ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। ভারতের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মাণ করেন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : তিনি একজন কথাশিল্পী। বাংলাদেশের ফরিদপুরের সদরদিতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠককে নিমগ্নচিত্তে গল্পপাঠে মুগ্ধতার সঙ্গে ধরে রাখার এক অসামান্য শিল্পশক্তির অধিকারী তাঁর গল্পমালা। শান্ত-নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন, নগরমুখী মফস্বল শহরের ভাসমান মধ্যবিত্ত এবং মহানগরী কলকাতার সীমায়িত এলাকার অভিজ্ঞতা তার উপন্যাসগুলির মূল উপজীব্য।

নলিনীরঞ্জন সরকার : তিনি একজন অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার অদূরে সাজিউড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় তিনি ভারতে চলে যান। বাঙ্গলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে তিনি ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : তিনি কথাসাহিত্যিক ছিলেন। প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'নারায়ণ' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গিতে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাসুদেবপুরের নলচিরায়। ইতিহাসবোধ ও স্বাদেশিকতা তাঁর রচনার উপজীব্য। বাঙ্গলার নিসর্গ ও নদনদীর তরঙ্গমালা, বাঙ্গালির আদিম ও আরণ্যক জীবন তাঁর উপন্যাসে রোম্যান্টিকতার নিরিখে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হয়েছে।

নিবারণ পণ্ডিত : তিনি ছিলেন গণসংগীত রচয়িতা। ব্রিটিশ ভারতে ময়মনসিংহ জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাদের পরিবার মূলত কৃষিভিত্তিক হলেও পিতা ভগবানচন্দ্র শিক্ষকতা করার জন্য পণ্ডিত উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশভাগের পরেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আসেননি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আনসার বাহিনী তাকে কারারুদ্ধ করে এবং তিনি কারাগারে অত্যাচারের সম্মুখীন হন। এরপর কারাগার থেকে মুক্তি পেলে সেখান থেকে ছোটো-বড়ো নয়টি পরিবারকে নিয়ে তিনি ভারতে চলে আসেন।

নির্মলেন্দু চৌধুরী : তিনি পল্লীগীতি গায়ক। বাংলাদেশের সিলেটের সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। সুরমা থেকে গঙ্গা জয় করে নেওয়া এক নিভৃতচারী সংগীত সংগ্রামী। চল্লিশের দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে যাঁরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী।

নীহাররঞ্জন রায় : তিনি ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য সমালোচক। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী ছিলেন তিনি।

পি.সি. সরকার : তিনি জাদুকর ও লেখক। ভারতবর্ষের বিখ্যাত জাদুকর। তার পুরোনাম প্রতুল চন্দ্র সরকার। টাঙ্গাইল জেলার অশোকপুর গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অন্যতম একজন আন্তর্জাতিক জাদুকর ছিলেন যিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তার জাদু দেখিয়েছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন : তিনি ছন্দবিশারদ, ঐতিহাসিক, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ। তাঁর জন্ম কুমিল্লার মনিয়ন্দ গ্রামে। আদিনিবাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইলের চুন্টা গ্রামে। প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দবিষয়ক এক প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 'ছান্দসিক' বলে অভিহিত করেন। ছন্দচর্চা ও ইতিহাসচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা প্রবোধচন্দ্র সেনের আরেক সাধনা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রমথনাথ বিশী : তিনি একজন সাহিত্যিক, গবেষক। নাটোরের জোয়াড়ি গ্রামে জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। একজন সৃজনশীল লেখক ও মননশীল গবেষক হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর সমান খ্যাতি আছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধানত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

প্রিয়দা রঞ্জন রায় : তিনি রসায়নশাস্ত্রবিদ। চট্টগ্রামের রাউজানের নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৮৮-এর ১৬ জানুয়ারি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫১ সালে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোগে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত নব প্রতিক্রিয়া কমিশনের সদস্য পদে নির্বাচিত হন।

বিজন ভট্টাচার্য্য : তিনি একজন নাট্যকার, অভিনেতা। ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিজন ভট্টাচার্য মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষক শ্রমিক গরিব মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা ও বাঁচবার কথা তার নাটকগুলির মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরে তিনি এই ভাবনা থেকে সরে যান।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার : তিনি কবি, লেখক, অনুবাদক। ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে তাঁর জন্ম। সংস্কৃত, পালি, তামিল, তেলুগু, উড়িয়া, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। অতিরিক্ত পড়াশোনার জন্য ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তার স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। অন্ধ হয়েও তিনি যে অক্লান্ত ও অবিশ্রান্তভাবে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু : তিনি সাহিত্যিক, সমালোচক, সম্পাদক। ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর কুমিল্লায় জন্ম। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের মালখানগরে। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গল্পকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের নতুন কাব্যরীতির সূচনাকারী অন্যতম কবি হিসেবে তিনি সমাদৃত।

বেণীমাধব বড়ুয়া : তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মহামুনি গ্রামে তাঁর জন্ম। বেণীমাধব বহু গ্রন্থ ও গবেষণা নিবন্ধ রচনা করেন। অধ্যাপক বড়ুয়া Royal Asiatic Society of Bengal-এর Fellow, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য, কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি ও ইরান সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় : তিনি একজন জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা। তিনি জন্মেছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে

১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট। কলকাতায় বসে তার শিল্পের সব উত্তরণ ঘটালেও বাংলাদেশের দর্শক-শ্রোতার কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'ঢাকার ভানু'।

মনোজ বসু : তিনি কথাসাহিত্যিক। যশোহর জেলার ডোঙ্গাঘাটা গ্রামে বিখ্যাত বসু পরিবারে মনোজ বসুর জন্ম। কর্মজীবনে শিক্ষকতা করলেও দেড় শতাধিক গল্প-উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। তাঁর প্রথম গল্পসংকলন 'বনমর্মর'। সশস্ত্র বিপ্লবীদের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে রচিত 'ভুলি নাই' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ।

মেঘনাদ সাহা : তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী। ঢাকা জেলার তালেবাদ পরগনার অন্তর্গত সিওরাতলী গ্রামে ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর মেঘনাদ সাহা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানে তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাত। তার আবিষ্কৃত সাহা আয়নীভবন সমীকরণ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলি ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

যদুনাথ সরকার : তিনি একজন ইতিহাসবিদ। বর্তমান নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার কড়চমারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাস শাস্ত্রে অসাধারণ ও প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যদুনাথ সরকার। তাকে ইতহাস-চর্চায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা-গ্রন্থ রচনার জন্য বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও উর্দু, ফারসি, মারাঠি-সহ আরও কয়েকটি ভাষা শিখেছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল : তিনি লেখক, ইতিহাসবিদ ছিলেন। জন্ম পিরোজপুরের কুমিরমারা গ্রামে। উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নবজাগরণের ইতিহাস কৃতি বাঙ্গালিদের জীবন-চরিত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার : তিনি একজন ইতিহাসবিদ। জন্ম ফরিদপুরের খণ্ডপাড়া গ্রামে। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাধাগোবিন্দ বসাক : তিনি ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ববিদ। ঢাকা শহরের নবাবপুরে তাঁর জন্ম। প্রাচীন ইতিহাস, লিপি ও লেখাতত্ত্ব, পালি-প্রকৃত ও সংস্কৃত ভাষা এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র'।

শচীন দেববর্মণ : তিনি শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক। স্থায়ী বসতি আগরতলায়, জন্ম কুমিল্লায়। আশিটির অধিক বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবিতে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সতীশ রঞ্জন খাস্তগীর : তিনি পদার্থবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। জন্ম চট্টগ্রামে। কালক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এবং পরবর্তীতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পদার্থবিজ্ঞান শাখার প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুচিত্রা সেন : তাঁর পৈতৃক বাড়ি পাবনা শহরে। সেন ভাঙ্গাবাড়ি সুচিত্রার মাতামহ পঞ্চকবির অন্যতম রজনীকান্ত সেনের বাড়ি। সুচিত্রা সেনের বাল্যকালের কিছুটা সময় সেন ভাঙ্গাবাড়িতে কেটেছিল। তাঁর জন্মগত নাম ছিল রমা দাশগুপ্ত। তিনি মূলত বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সন্তোষ সেনগুপ্ত : তিনি ছিলেন সংগীত শিল্পী। ঢাকার বিক্রমপুরে জন্ম। আকাশবাণীর সংগীত শিক্ষার আসরে কিছুদিন রবীন্দ্রসংগীত শেখান। এইচ.এম.ভি. ও কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিতে প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন।

সমরেশ বসু : তিনি একজন লেখক। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের রাজানগর গ্রামে সমরেশ বসু জন্মগ্রহণ করেন। কালকূট ও ভ্রমর তার ছদ্মনাম। তার রচনায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, শ্রমজীবী মানুষের জীবন এবং যৌনতা-সহ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুনিপুণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : তিনি প্রথিতযশা বাঙ্গালি সাহিত্যিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম মাদারীপুর মহকুমার ফরিদপুর জেলায়, কালকিনি থানার মাইজপাড়া গ্রামে। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্ববৈশ্বিক বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলাভাষী এই ভারতীয় সাহিত্যিক একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সম্পাদক, সাংবাদিক ও কলামনিস্ট হিসেবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস : তিনি সংগীতশিল্পী ও সুরকার। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের মিরাশির বাসিন্দা ছিলেন। মূলত লোকসংগীতকে কেন্দ্র করে গণসংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

বিজয় সরকার : তিনি একজন ইতিহাসবিদ। নড়াইলের ডুমদি গ্রামে জন্ম। বাংলাদেশের কবিগানে বিশেষ উৎকর্ষ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ : সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। যশোহরের চৌগাছা গ্রামে তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। সংবাদপত্রের কাটিং দিয়ে বিষয়ানুগ বিন্যাসের সূত্রপাত সর্বপ্রথম তিনিই শুরু করেন।

সন্তোষ কুমার ঘোষ : তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের রাজবাড়ির বাসিন্দা ছিলেন। কিনু গোয়ালার গলি তার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়ে বাংলা সাংবাদিকতায় নতুনত্ব আনেন।

পরান বন্দ্যোপাধ্যায় : তিনি ছিলেন অভিনয়শিল্পী। বাংলাদেশের যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রের একজন খ্যাতনামা শিল্পী।

তারাপদ রায় : তিনি কবি, ছোটোগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তারাপদ রায়ের জন্ম অবিভক্ত বাঙ্গলার অধুনা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ কবি, ছোটোগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। বাংলা সাহিত্যে হালকা হাস্যরসের সঙ্গে পরিমিত তিক্তরস মিশ্রণের পারঙ্গমস্রষ্টা তিনি।

এছাড়াও 'কিনু গোয়ালার গলি' ও 'শেষ নমস্কার' উপন্যাসের রচয়িতা **সন্তোষ কুমার ঘোষ** ফরিদপুরের লোক। বর্তমান সময়ের অভিনেতা পরান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলেখা মিত্রের বাড়ি কিশোরগঞ্জ ও ফরিদপুর। রম্য লেখক তারাপদ রায়ের আদি বাড়ি টাঙ্গাইলে।

বিখ্যাত নিউরোসার্জন **রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত** চট্টগ্রামের হাট হাজারীর নন্দীরহাটের বাসিন্দা। সম্প্রতি ৬৪ বছর পর চট্টগ্রামে তাঁর জন্মস্থানে এসে মাথা ঠুকে কেঁদে গেছেন। রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত (রবীন) সম্প্রতি ইউ.কে-এর এনএইচএস-এর চাকুরি থেকে অবসরে যান। অবসরে যাবার আগে তিনি ইউনিভার্সিটি অব নিউক্যাসেলের চিফ নিউরোসার্জন ছিলেন।

বরেণ্য শিল্পী **নচিকেতার** পৈতৃক নিবাস

ছিল বাংলাদেশের বরিশালের ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলার চেচরীরামপুর গ্রামে।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় : ব্রিটিশ ভারতের যশোর খুলনা জেলায় কপোতাক্ষ নদ ঘেরা রাড়ুলী গ্রামে ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রসায়নবিদ কি শুধুই বেঙ্গল কেমিক্যাল বা হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের সঙ্গে যুক্ত। আজ ভুলে গেলেও তিনিই ছিলেন ফাদার অব ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রি। অজৈব যৌগ মারকিউরাস নাইট্রাইট ও জৈব যৌগ স্যাকারিনের আবিষ্কারের পরে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধি দেন। তার নামের আগে স্যার বা আচার্য উপাধি বসে। যদিও তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশি।

সংগীতের অনেক দিকপালের জন্ম বাংলাদেশে, যারা পরবর্তীতে ভারত তথা দুনিয়াজুড়েই বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই নাম আসে **ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর**। তিনি জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গায়ক কিশোর কুমারের জন্মও এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কিংবদন্তি **শচীন দেব বর্মণের** জন্ম কুমিল্লায়। **সাগর সেনের** জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে।

তপন রায় চৌধুরী : তিনি ছিলেন ইতিহাসবিদ। বরিশালের কীর্তিপাশায় ১৯২৫ সালে তাঁর জন্ম। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন।

সত্যেন সেন : বিশিষ্ট এই লেখকের জন্ম ২৮ মার্চ, ১৯০৭ সালে। তাঁর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলা) টংগিবাড়ি উপজেলার সোনারং গ্রামের সেন পরিবারে। বিশিষ্ট এই লেখকের পিতার নাম ধরণীমোহন সেন এবং মাতার নাম মৃণালিনী সেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি নিদর্শন এবং বাংলা সাহিত্যের অনন্য পথিকৃৎ।

এখানে শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক মহান কীর্তিমানের নাম উল্লেখ করা হলো। হাজার হাজার মানুষ আছেন যাঁরা পূর্ববঙ্গে অথবা পাকিস্তানে জন্ম নিয়ে, পরে ভারতে এসে অনন্য অবদান রেখে গেছেন এবং এখনো নিরলস ভারত গড়ার কাজে মনোনিবেশ রেখেছেন।

(তথ্য সূত্র : ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নিবন্ধ এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারি, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—
শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১
শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

গিলগিট-বাল্টিস্তানে পাক সরকারের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ট্যুইটারের তরফে পাক-অধিকৃত গিলগিট-বাল্টিস্তানে পাকিস্তান সরকারের ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটির লোকেশন স্থানান্তরিত হয়ে ভারতের মধ্যে দেখানো হচ্ছে।

Twitter 'relocates' users in GB to held Kashmir

Jamil Nagri | Published July 9, 2023 | Updated about 7 hours ago

0

0:00 / 6:03 1x 1.2x 1.5x

GILGIT: Twitter seems to have blocked access to the government of Pakistan's official account in Gilgit-Baltistan and changed the region's location to parts of India, it has emerged.

In addition, when users turn on the location feature on the app, tweets sent from the region are marked as originating from India-held Kashmir.

পাক দৈনিক ডনে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গিলগিট-বাল্টিস্তানে পাকিস্তানের অফিসিয়াল ট্যুইটার অ্যাকাউন্টটি ট্যুইটারের পক্ষ হতে ব্লক করা হয়েছে ও অ্যাকাউন্টটির লোকেশন ভারতের অন্তর্গত জম্মু-কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে দেখানো হচ্ছে। গিলগিট-বাল্টিস্তানের স্থানীয় ট্যুইটার ব্যবহারকারীরা অ্যাপটির লোকেশন ফিচার ব্যবহার করে ট্যুইট করলেও সেই ট্যুইট গুলির উৎস জম্মু-কাশ্মীর বলেই চিহ্নিত হচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের অফিসিয়াল ট্যুইটার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করতে পারছেন না বলে গিলগিট-বাল্টিস্তানের একাধিক ট্যুইটার ব্যবহারকারী অভিযোগ জানিয়েছেন। তাদের তরফে ওই অ্যাকাউন্টটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হলে-'আইনগত দাবির প্রেক্ষিতে ভারতে এই অ্যাকাউন্টটিকে স্থগিত করা হয়েছে'— লেখা একটি মেসেজ বারংবার প্রদর্শিত হচ্ছে।

পাকিস্তানি আধিকারিকরা এরকম ঘটনার কথা যদিও অস্বীকার করেছে ও এইসব দাবিকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে। গিলগিট- বাল্টিস্তানে ইন্টারনেট স্বাধীনতা, সামাজিক মাধ্যম - সংবাদমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপিত নেই বলে তারা দাবি করেছে। যদিও স্থানীয় লোকজন ট্যুইটার লোকেশনের এই পরিবর্তন ও পাক-সরকারের অফিসিয়াল ট্যুইটার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তারা ব্যর্থ হয়েছেন বলেই জানাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, গিলগিট-বাল্টিস্তানে পাক-সরকারের এই অফিসিয়াল ট্যুইটার অ্যাকাউন্টটি মার্চ, ২০২৩ থেকেই ভারতে নিষিদ্ধ এবং আইনি অভিযোগ দায়ের হওয়ার দরুণ ২০২২ সালেও তা দু'বার স্থগিত হয়ে যায় বলে সংবাদসূত্রে প্রকাশ। গিলগিট-বাল্টিস্তানের কিছু ট্যুইটার ব্যবহারকারী বলছেন যে ট্যুইট করলে সেখানে তারা পাকিস্তানের কোনো লোকেশনকে সংযুক্ত করতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে ট্যুইটারে জম্মু-কাশ্মীরকেই একমাত্র লোকেশন দেখানো হচ্ছে। ভারত প্রভাব খাটিয়ে গিলগিট- বাল্টিস্তানের ক্ষেত্রে ট্যুইটারের জিওট্যাগিংয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকতে পারে বলে তারা মনে করছে। এই ঘটনা পাক-অধিকৃত গিলগিট- বাল্টিস্তানের 'স্বশাসিত' পরিচয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্রেক করছে।

'স্বাবলম্বন সে সমৃদ্ধি' খাদিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন (কেভিআইসি) 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, বিশ্বের সামনে ভারতের এক অনন্য চিত্র তুলে ধরেছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবার কেভিআইসি-র পণ্য থেকে আয়ের পরিমাণ ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। গত নয় অর্থ বছরে, গ্রামীণ এলাকায় কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত দেশীয় খাদি পণ্য বিক্রিতে ৩৩২ শতাংশ লাভ হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ভোকাল ফর লোকাল' এবং 'স্বদেশী পণ্যের' প্রতি দেশের মানুষের আস্থা যে

বেড়েছে তার প্রমাণ এই সাফল্য। ২০১৩-'১৪ অর্থবছরে, যেখানে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পণ্যের ব্যবসা ছিল ৩১,১৫৪ কোটি টাকা, এটি ২০২২-'২৩ অর্থবছরে বেড়ে ১,৩৪,৬৩০ কোটি টাকা হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংগ্রহ। একইভাবে, গ্রামাঞ্চলে ৯,৫৪, ৮৯৯ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে কেভিআইসি গ্রামের মানুষদের স্বাবলম্বী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি মঞ্চ থেকে খাদির প্রচার করেছেন, যার কারণে খাদি প্রতিটি শ্রেণি ও বয়সের মানুষের পছন্দ হয়ে উঠেছে। এখন খাদি পণ্য বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের মধ্যে অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়। □

এখন গ্রামাঞ্চলেও সস্তা ও গুণমানসম্মত ওষুধ পাওয়া যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের সাধারণ নাগরিকদের তাঁদের বাড়ির কাছে সস্তা ও গুণমানসম্পন্ন ওষুধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে সরকার অনেকগুলি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সংকল্প পূরণের জন্য ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশে ২০০০ প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিগুলিতে (পিএসিএস) প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ৬ জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত জানান। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ বাড়ির কাছে সস্তা ও মানসম্পন্ন ওষুধ পাওয়া যাবে এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত পিএসিএসকে শক্তিশালী করছে। কম্পিউটারাইজেশন হোক বা ৩০০টি কমন সার্ভিস সেন্টার চালু করার চুক্তি হোক, বা আগামী ৫ বছরে ২ লক্ষ নতুন পিএসিএস তৈরির সঙ্গে প্রতিটি পঞ্চায়েতে একটি বহুমুখী পিএসিএস তৈরির জন্য বাজেটে বিধান করা হোক, এইসব উদ্যোগই ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তগুলি পিএসিএস-এর সঙ্গে যুক্ত ১৩ কোটি কৃষক সদস্য-সহ গ্রামাঞ্চলের মানুষকে উপকৃত করবে। ২০০০ পিএসিএস চিহ্নিত করা হবে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। প্রাথমিকভাবে, আগস্ট মাসের মধ্যে ১০০০টি জন ঔষধি কেন্দ্র এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১০০০ কেন্দ্র খোলা হবে।

এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ৯৪০০ টিরও বেশি প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ২০১৪ সাল নাগাদ এই কেন্দ্রগুলির সংখ্যা একশোরও কম ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রগুলিতে ১৮০০ ধরনের ওষুধ ও ২৮৫ ধরনের চিকিৎসা সরঞ্জাম পাওয়া যায়। জন ঔষধি কেন্দ্রে ব্র্যান্ডেড ওষুধের তুলনায় ৫০-৯০ শতাংশ কম দামে ওষুধ পাওয়া যায়।

কেন্দ্র স্থাপনের যোগ্যতা: প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আবেদনকারীদের অবশ্যই ডি.ফার্মা বা বি.ফার্মা ডিগ্রি থাকতে হবে। এর জন্য যে কোনো সংস্থা, এনজিও, দাতব্য সংস্থা ও হাসপাতাল বি.ফার্মা ও ডি.ফার্মা ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ করতে পারে। জন ঔষধি কেন্দ্রের মালিকানা বা ভাড়ার জন্য কমপক্ষে ১২০ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। জন ঔষধি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে ৫০০০ টাকা লাগবে। মহিলা উদ্যোক্তা, দিব্যাঙ্গ, তপশিলি জাতি ও প্রাক্তন সৈনিকরা বিশেষ বিভাগের অধীনে পড়েন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর-পূর্বের রাজ্য ও দ্বীপগুলি বিশেষ অঞ্চলের অধীনে পড়ে। বিশেষ বিভাগ ও বিশেষ অঞ্চলের আবেদনকারীদের আবেদন করার অর্থ জমা করার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া: প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রের জন্য প্রণোদনার পরিমাণ হলো ৫ লক্ষ টাকা (মাসিক ক্রয়ের ১৫ শতাংশ বা প্রতি মাসে সর্বাধিক ১৫,০০০ টাকা)। নির্দিষ্ট বিভাগ ও সেক্টরে তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিকাঠামো ব্যয়ের জন্য ২ লক্ষ টাকার এককালীন অতিরিক্ত প্রণোদনাও প্রদান করা হয়।

শোকসংবাদ

কলকাতার স্বয়ংসেবক কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট নন্দলাল সিংহনিয়ার সহধর্মিণী গঙ্গা সিংহনিয়া সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর দুই পুত্র সুনীল ও শরদ সিংহানিয়া এবং দুই পুত্রবধূ আইনজীবী। উল্লেখ্য শ্রীমতী সিংহানিয়া রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকা ছিলেন।

* * *

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক অধুনা কলকাতা নিবাসী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা তথা প্রাক্তন রাজ্য কার্যালয় সেক্রেটারি নীহারেন্দু দত্ত গত ৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ১ পুত্র ও পুত্রবধূকে রেখে গেছেন।

* * *

মালদা নগরের অরবিন্দ শাখার স্বয়ংসেবক তথা নগর শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ বিপ্লব দাসের ঠাকুমা চাঁদবালা দাস গত ৪ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছি ৭৩ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী পুস্তক সম্ভারের দোকান বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্রের মালিক অরুণ ঘোষ গত ২৯ জুন পরলোকগমন করেন। প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও হাজার পুলিশি নির্যাতন সহ্য করে তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী পুস্তক ভাণ্ডারটি টিকিয়ে রেখেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৫২।।

ইতিমধ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার বাগুইহাটির কাছে রঘুনাথপুরে স্থাপন করা হয় মহানাম অঙ্গন। এইখানেই মহানামব্রতজী স্থায়ীরূপে বাস করেন পরবর্তীকালে। প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রন্থাগার আর দাতব্য চিকিৎসালয়। মাসিক পত্রিকা বার করা হয় ১৯৮৩ সালে, যার নাম 'আঙ্গিনা'। পরে যার নাম পরিবর্তন করে হয় 'মহানাম অঙ্গন'।

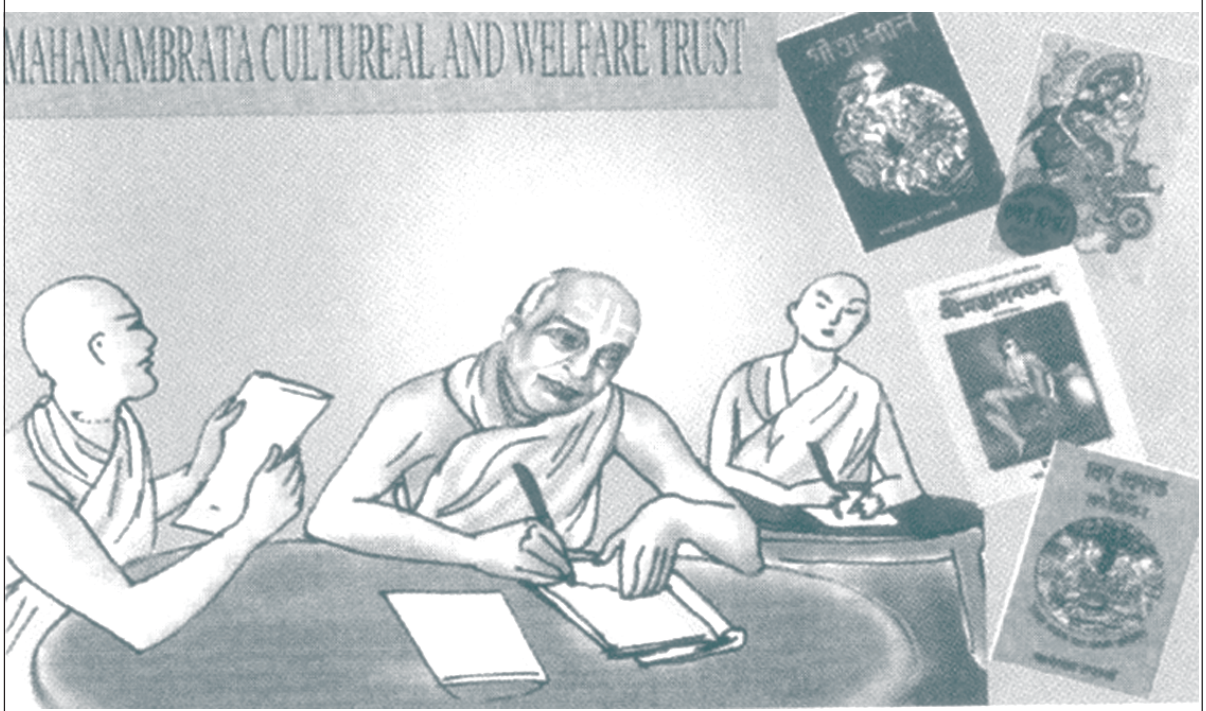

১৯৮২ সালে 'মহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা দিতে এগিয়ে এলেন তাঁরা। প্রকাশ হতে লাগল মহানাম গ্রন্থাবলী। কালে কালে শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

(ক্রমশ)